অরণ্যে একা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

"ডক্টর নীহাররঞ্জন গুপ্ত
শ্রদ্ধাস্পদেষু"

তে পারেনি

এই লেখকের :

দেহপট
বাতাসে বারুদ
পিঞ্জরের গান
আঁধার পেরিয়ে
নায়িকার মন
অন্য দেশ অন্য দাহ
চন্দন বাঈ
ময়ূর ময়ূরী
মধ্যাহ্নের মেঘ
কামনার ধূপ
বন্ধনে ফেরা

কাল রাতে আবার শমিতা এসেছিল।

অর্জুন আর মেহগনি গাছের জটলার উর্দ্ধে তারার চুমকি দেওয়া অখণ্ড আকাশ। জানলার ফ্রেমে বাঁধা অরণ্যের ছবি। অন্ধকার রাত তাই দিগন্তে আঁকা সিদ্ধাই পাহাড়ের তরঙ্গায়িত রেখা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

এদেশের লোক বলে সিধাই ডিংরি। কে জানে কবে কোন অতীতে ওই পাহাড়ের গুহায় সংসারত্যাগী কোন মুক্তপুরুষ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রপঞ্চময় জগৎ যে নশ্বরতার প্রতীক তাই প্রমাণ করার জন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তপস্যা।

ঠিক জানলার বাইরে যেখানে ফালি বারান্দায় গোটা দুয়েক টব রেখে বিজিত উদ্যান রচনার চেষ্টা করেছিল, সেখানে এসে শমিতা দাঁড়িয়েছিল।

সারাটা দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিছানায় দেহ ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিজিত গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। পৃথিবীর কোন বর্ণ, গন্ধ, কারো উপস্থিতি সম্বন্ধে মোটেই সজাগ নয়।

তাই শমিতাকে বিজিতের ঘুম ভাঙাবার জন্য চুড়ির শব্দ করতে হয়েছিল। জলতরঙ্গের মতন, কিংবা পাইনের পত্রগুচ্ছের মধ্য দিয়ে বাতাসের কাঁপনের তরঙ্গের মতন সে শব্দ। কিন্তু বিজিতকে জাগাতে পারেনি।

তাই খুব মৃদুকণ্ঠে, প্রায় অস্পষ্ট স্বরে শমিতাকে বলতে হয়েছিল।

এই শুনছ, কত ঘুমোবে তুমি!

আস্তে আস্তে বিজিত চোখ খুলেছিল

আধ তন্দ্রা আধ জাগরণের উপকূলে ঠিক কিছু বুঝতে পারেনি

মনে হয়েছিল, কেউ তাকে ডাকছে। চেতনার ওপার থেকে লঘুকণ্ঠে, গায়ে আলতো পালক স্পর্শ করানোর মতন খুব মৃদুকণ্ঠে কেউ কিছু বলছে তাকে।

অন্ধকারকে বিজিতের চিরকালের ভয়। তাই একেবারে কোণে নীলাভ আবছা একটা আলো ঘরটিকে আরো যেন মোহময় করে তুলেছে। অন্ধকার সরেনি, আলোও ছড়িয়ে পড়েনি, এমনই অবস্থা।

'তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

শমিতা আরো সরে এসেছিল। একেবারে জানলার ধারে। শার্সীতে তার নিশ্বাসের দাগ পড়ছে।

শমিতা যদি চায়, যদি সে ইচ্ছা করে, হাত বাড়িয়ে বিজিতের দেহ ছুঁতে পারে।

কিন্তু ছুঁল না। দেহের প্রতি তার কোন আকর্ষণই নেই। বুঝি কোনদিনই ছিল না।

যখন বিজিত ধরা দেবার জন্য উন্মুখ ছিল, তখনও নয়।

শমিতাকে বিজিত চিনতে পারবে না, তা কি হয়!

কত বছর, মনে মনে বিজিত হিসাব করল। এক ফাল্গুনে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। পরের ভাদ্রে শমিতা হারিয়ে গিয়েছিল।

সাতটা মাস একটা মানুষের জীবনের অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ। কোন রমণীকে চেনার পক্ষে হয়তো যথেষ্ট নয়।

কিন্তু বিজিত শমিতাকে চিনতে পেরেছিল। জানতে পেরেছিল।

তার কারণও ছিল।

মাটির ওপরে গাছের যে পত্রসম্ভার যে পুষ্পসজ্জা দেখা যায়, সেটাই কি গাছের সব?

লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার কোষে গাছ তার শিকড়ের জাল ছড়িয়ে প্রাণরস সংগ্রহ করে, সেখানেও তো তার পরিচয় লুকানো।

বিজিতের সাত মাসের জীবনের আগে পুরো তিনটি মাস সে

শমিতার সঙ্গে ছায়ার মতন জড়িয়ে ছিল। তার সুখ-দুঃখের অংশীদার, তার প্রাণচাঞ্চল্যের সরব সাক্ষী।

'তুমি কেন এভাবে আস? জান না এতে আমার কষ্ট হয়?'

বালিশে ভর দিয়ে বিছানায় উঠে বসে বিজিত প্রশ্ন করল।

তার কণ্ঠ রীতিমত কাঁপছে। ঝড়ে ভয় পাওয়া পাখির বুকের মতন।

শমিতা কি হাসল! শব্দহীন হাসি কিংবা অল্প শব্দ বোধ হয় হয়েছিল, না হলে হাসির আওয়াজে কেন বিজিত সচকিত হয়ে উঠবে।

'তোমাকে কষ্ট দিতে আমার ভাল লাগে। তুমি কষ্ট পাও, তাই আমি আসি।'

'কষ্ট দিতে আস?' বিজিত অস্পষ্ট সুরে স্বগতোক্তি করল, 'এ তোমার কি নিষ্ঠুর খেলা? এমন সর্বনাশা খেলায় তুমি কি আনন্দ পাও।'

আবার হাসির শব্দ। সাঁওতালদের দূরাগত বংশীধ্বনির মতন।

তারপর জলে যেমন আলপনার রেখা মুছে যায়, তেমনভাবেই শমিতার রূপরেখা নিঃশেষে মুছে গেল।

শমিতা কোথাও নেই। কোনদিন কোথাও ছিল, এমন প্রমাণও দেখা গেল না।

ততক্ষণে বিজিতের কপালে ঘামের বিন্দু। উত্তেজনায় হৃদস্পন্দন দ্রুততর। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছবি।

চেঁচিয়ে মংলুকে ডাকবার ইচ্ছা হ'ল।

ঘরের বাইরে, চৌকাঠের কাছেই মংলু শুয়ে আছে।

অত্যন্ত সজাগ ঘুম। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপলে উঠে বসে।

বিজিতের এক ডাকে ছুটে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াবে।

একটু জল পেলে হ'ত।

ঘরের কোণে কাচের সোরাই আছে। সোরাইয়ের মুখে গ্লাশ।

বিজিত অনায়াসেই উঠে জল গড়িয়ে নিতে পারে।

কণ্ঠ শুধু নয়, বুক পর্যন্ত আতপদগ্ধ মাঠের মতন শুকনো।

কিন্তু বিজিতের সাহস হ'ল না।

সোরাই ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আর একজনের হিমশীতল স্পর্শ হাতে লাগে।

তৃষ্ণার চেয়েও মারাত্মক আর এক অনুভূতিতে বিজিত অস্থির হয়ে পড়বে।

এই যে কষ্টকর অবস্থা, এই প্রাণান্তকর বিপর্যয়, এসব কিন্তু রাতের কালো যবনিকা সরে যাবার সঙ্গেই দূরীভূত হয়।

দিনের আলোয় বিজিত সুস্থ, সবল মানুষ। জাঁদরেল অফিসর। যে অরণ্যের আত্মার সন্ধান পেয়েছে, শাল, সেগুন, মেহগনির চারা যার কাছে অন্তরের আত্মীয়।

আদিবাসীরা অরণ্যের দূর প্রান্তে গাছ কাটতে শুরু করেছে। শুধু গাছ কাটাই নয়, মাথায় নিয়ে নিজেদের ডেরার দিকে পালাচ্ছে।

খবর কানে যেতেই বিজিত বন্দুক সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে জীপে উঠে পড়ে। বাহাদুরকে আদেশ দেয়।

'বাহাদুর, ফুলগিরির দিকে চালাও। যত স্পীডে পার।'

একাগ্রচেতনা, কর্তব্যসজাগ এই মানুষটিকে দেখলে রাতের অন্ধকারে কম্পান্বিত আর এক সত্তার কথা কল্পনাও করা যায় না।

মাঝপথে অপরাধীদের আটক করা হয়।

ছেলে, বুড়ো, মেয়ের দল। মাথায় কাঠের বোঝা। বুনো লতা দিয়ে বাঁধা।

দলের সর্দার এগিয়ে আসে।

'তোদের তো এত আছে বাবু, আমাদের রাঁধবার কাঠ নাই। এ কটা ছেড়ে দে বাবু।'

বিজিত হাসল। লোকগুলো তাকে এত বোকা পেয়েছে। শাল, সেগুন, মেহগনি দিয়ে উনান ধরাবে?

আসল কথা বিজিতের খুব জানা।

জঙ্গলের সীমানার বাইরে লরি নিয়ে লোক অপেক্ষা করছে। এই সব কাঠ সেই লরিতে চালান হবে। বুড়ো সর্দারের গেঁজে নোটে ফুলে উঠবে।

'কাঠ নামা সব। একটা কথা নয়। দেখছিস আমার হাতে কি?'

বন্দুকটা তাক করে বিজিত দাঁড়াল।

বন্দুক দেখে সর্দার যত না ভয় পেল, তার চেয়ে বেশী ভয় পেল, বিজিতের দৃঢ় গলার আওয়াজে।

কিছু বলা যায় না, বেপরোয়া এই বাবু হয়তো গুলিই ছুঁড়ে বসবে।

'ওসব করিস নাই বাবু, এই নে তোর কাঠ। তবে এটা ঠিক জানিস বোঙ্গাবাবা তোকে ছাড়বে নাই। তোর বুকে আগুন জ্বালাবে। অশান্তির আগুন।'

পলকের জন্য বিজিতের কঠিন দেহটা যেন শ্লথ হয়ে যায়। চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে আসে। একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

তাহলে কি বোঙ্গাবাবার অভিশাপেই রাতের অন্ধকারে শমিতা বিজিতের বুকে অশান্তির আগুন জ্বালাতে আসে!

কিন্তু বিজিত ছাড়ে না।

ফেলে যাওয়া কাঠ পাহারা দিতে দিতে বাহাদুরকে বল্লে, 'তুমি চলে যাও বাহাদুর, একটা লরি পাঠিয়ে দাও। এই সব কাঠগুলো লরিতে তুলে নেবে।'

আদেশ পাবার পরও বাহাদুর ইতস্তত করে।

কিছু বলা যায় না। এভাবে এখানে বিজিতের একলা থাকা উচিত হবে না। হয়তো ঝোপের অন্তরাল থেকে তীরের ঝাঁক এসে পড়বে। বিষ মাখানো তীরের ফলা ত্বক ভেদ করে দেবে। বিষ রক্তে গিয়ে মিশবে।

বিজিত নিশ্চিন্ত। তার অসহায় অবস্থার জন্য সে মোটেই উদ্বিগ্ন নয়।

অরণ্যকে বিজিত ভালবাসে। কর্তব্যকেও।

আরও ভালবাসার সামগ্রী তার ছিল।

কৈশোরের স্বপ্ন দিয়ে, যৌবনের প্রেরণা দিয়ে যে মূর্তি সে গড়েছিল, সে মূর্তি শমিতার।

একেবারে হঠাৎ দেখা। আগের কোন প্রস্তুতি নেই, কোন আয়োজন নয়, তৈরি সংলাপও ছিল না।

বাইরের ঘরে বসে বিজিত বিজ্ঞানের বই পড়ছিল। সামনে পরীক্ষা। অবশ্য পরীক্ষাকে তার কোন ভয় ছিল না। কোনদিনই নয়। শিক্ষিত ঘোড়া যেমন অনায়াস পটুত্বে একটার পর একটা বেড়া পার হয়ে যায়, বিজিত তেমনইভাবে স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এবার স্বতন্ত্র ব্যাপার।

হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা। এবারের প্রতিযোগী শুধু ক্লাশের ছাত্ররা নয়, অন্য স্কুলের ছাত্ররাও। এই পরীক্ষার কষ্টিপাথরে বিজিতের মেধার যাচাই হবে।

হঠাৎ আকাশ কালো করে কখন বৃষ্টি নেমেছে, তন্ময় বিজিত খেয়াল করেনি।

খেয়াল হ'ল এক কিশোরীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে।

'কি, কানে কম শোনেন নাকি? কখন থেকে চেঁচাচ্ছি।'

বিজিত উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'আমাকে কিছু বলছেন?'

'আর এখানে কে আছে? আর কাকে বলব!'

অপ্রস্তুত বিজিত আরও এগিয়ে এসে প্রায় গরাদে মুখ ঠেকিয়ে বলেছিল।

'বলুন, কি বলবেন?'

আরক্তমুখে কিশোরী প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল।

'আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি, দেখছেন না কিভাবে ভিজে যাচ্ছি।'

তখন বিজিতের চেতনা হয়েছিল।

তাই তো, অঝোরধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে মেঘও ডাকছে। সরু ফালি রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে মেয়েটি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

শাড়ী বেয়ে, চুল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

এক হাতে বইযের গোছা শাড়ীর আঁচলে ঢাকা। অন্য হাতে চটি।

বিজিত দ্রুতপায়ে এসে দরজা খুলে বলেছিল।

'আসুন, ভিতরে আসুন।'

কিশোরীর বয়স চোদ্দ পনেরর বেশী নয়। আয়ত নিষ্পাপ দুটি চোখ দেখলে আরো যেন ছোট মনে হয়।

'মা, মা।'

বিজিত নিজের মাকে ডেকেছিল।

বাইরে অঝোর ধারাপাত, আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে সিক্ত মেয়েটির সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে বোধ হয় বিজিতের নিজেকে অসহায় মনে হয়েছিল।

বিজিতের মা ঘরে ঢুকেই চমকে উঠেছিলেন।

মেয়েটি এ পাড়ার কেউ নয়। পাড়ার হ'লে পথে ঘাটে কোনদিন দেখতে পেতেন। অজানা, অচেনা মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে?

কিন্তু এ সব কথা মনের মধ্যে উঠেই মিলিয়ে গেল।

সিক্ত বস্ত্রে মেয়েটি কাঁপছে। অসময়ের বৃষ্টি। বাতাসে শীতের মিশেল।

'ইস্, একেবারে ভিজে গেছ যে মা। এস আমার সঙ্গে।'

এবার কিশোরী কুণ্ঠিত হ'ল।

দ্বিধাগ্রস্থ গলায় বলল।

'ঠিক আছে, ব্যস্ত হবেন না। বৃষ্টি এখনই থেমে যাবে। বৃষ্টি থামলেই আমি চলে যাব। এটুকু ভিজলে আমার কিছু হবে না।'

বিজিতের মা ঠোঁট টিপে হাসলেন।

'একটুখানি ভেজাই বটে। কোন কথা শুনব না। এস ভিতরে।'

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে শরীর মুছে বিজিতের মায়ের একটা শাড়ী পরে মেয়েটি যখন আবার বাইরের ঘরে এসে বসল, তখন হঠাৎ যেন বিজিতের তাকে নতুন মনে হ'ল।

লাল পাড় শাড়ী, সাদা জমি, চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো, খালি পা।

প্রায় পিছনেই বিজিতের মা এসে দাঁড়ালেন। হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে প্লেট বোঝাই পাঁপর।

'নাও শমিতা, চাটা আগে খেয়ে নাও। আদা দিয়েছি। তোমার ভালই লাগবে। যা ভিজেছ।'

বিজিত বুঝতে পেরেছিল, নেপথ্যে কিশোরীর নাম ধাম সবই তার মা জেনে নিয়েছেন।

মা-ই বললেন,

'শমিতা আমাদের রাখীর বন্ধু। একসঙ্গে মডেল স্কুলে পড়ে। রাখীকে চিনিস তো?'

বিজিত রাখীকে চেনে। মোড়ের দত্তবাড়ীর মেয়ে। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে মেয়েটিকে সামনের বাগানে বেড়াতে দেখেছে। চোখে চশমা, শীর্ণ চেহারার মেয়ে। বয়সে শমিতার চেয়ে বড় হলেও এখনও ফ্রক পড়ে।

চা পাঁপর খাওয়া শেষ করেই শমিতা উঠে দাঁড়াল।

বৃষ্টি থেমেছে। তবে থমথমে অন্ধকার চারদিক ঘিরে। আকাশে মেঘের ভার। যে কোন মুহূর্তে আবার বর্ষণ শুরু হতে পারে।

জানলা দিয়ে হাত প্রসারিত করে শমিতা বাইরের অবস্থা দেখল, তারপর বলল, 'বৃষ্টি থেমেছে, আমি এবার যাই। আমার বই খাতা?'

'এনে দিচ্ছি।'

বিজিতের মা ভিতরে গিয়ে বই খাতাগুলো এনে দিলেন।

'দাঁড়াও, এই অন্ধকারে একলা যেতে হবে না, বিজিত তোমার সঙ্গে যাবে।'

কোলের ওপর বই রেখে বিজিত এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল।

অনেকদিন আগে কাদের পোষা টিয়া একবার বিজিতদের জানলায় এসে বসেছিল। ঘাড় বেঁকিয়ে ঘরের মধ্যে দেখেছিল।

গাঢ় সবুজ রং, লাল টুকটুক ঠোঁট, গলার কাছে রক্তিম আঁচড়।

হঠাৎ সেই টিয়ার কথা বিজিতের মনে পড়ে গেল।

'না, না, আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। আমি ঠিক চলে যেতে পারব।'

ইতিমধ্যে মায়ের ইশারায় বিজিত বই রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাবছে, ভিতরে গিয়ে ফর্সা একটা সার্ট গায়ে দিয়ে আসবে কিনা।

দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই শমিতা থমকে দাঁড়াল।

হেসে বলল, 'আমার কাণ্ড দেখেছেন, আপনার শাড়ী ব্লাউজ পরেই চলে যাচ্ছি। খেয়ালই নেই। এগুলো বদলে নিই।'

বিজিতের মা বাধা দিলেন।

'ও মা, সে সব পরবে কি করে? এখনও টপ টপ করে জল ঝরছে। আমি ঘরের মধ্যে মেলে দিচ্ছি। বিজিত তো যাচ্ছে, তোমাদের বাড়ি চিনে আসবে। কাল বরং ওগুলো দিয়ে আসবে। অসুবিধা হবে?'

'অসুবিধা? না অসুবিধা আর কি। তাহলে কাল উনি যখন যাবেন তখন ওঁর হাতেই আপনার জামাকাপড় ফেরৎ দিয়ে দেব।'

শমিতার পিছন পিছন বিজিত বাইরে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকারের জন্য অনেক বাড়িতে অসময়ে বাতি জ্বেলেছে।

পথচারীর সংখ্যা কম। যে কজনকে দেখা গেল, সবাই দুর্যোগের ভয়ে দ্রুত চলছে। দু-একটা রিক্সাও দেখা গেল।

চৌরাস্তার কাছ বরাবর গিয়ে বিজিতের মনে পড়ল।

সঙ্গে একটা ছাতা আনলে হ'ত। হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে, তাহলে দুজনকেই ভিজতে হবে।

অবশ্য এক ছাতার তলায় দুজন এমন একটা অবস্থা কল্পনা করেও বিজিত প্রায় শিউরে উঠল।

বিজিত মা বাপের একমাত্র সন্তান। তার বোন নেই, কাজেই বোনের বান্ধবীদের সমাগমের সম্ভাবনা ছিল না। দূর সম্পর্কীয়া কোন অনুজার কথাও সে মনে করতে পারল না।

তার একমাত্র সঙ্গী বই। পড়াশোনার অবকাশে মা বাবার সঙ্গে হৈ হৈ করে।

'বইগুলো একটু ধরবেন?'

আচমকা শমিতার কথায় বিজিতের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।

শমিতা বই খাতা এগিয়ে দিয়েছে।

কিছু না ভেবেই বিজিত সেগুলো নিজের হাতে নিল।

এই বই খাতা উনানের পাশে রাখা হয়েছিল, তাই সেগুলোয় তখনও উত্তাপ ছিল।

বিজিত কবি নয়, তাহলে এই উত্তাপের গভীর কোন অর্থের সন্ধান করতে পারত।

সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে জল।

এখানে একটু বৃষ্টিতেই জল দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ থাকে।

শমিতা চটি জোড়া খুলে হাতে নিল, আর এক হাতে শাড়ীর প্রান্ত সামান্য গুটিয়ে নিল, তারপর জল পার হয়ে গেল।

বিজিত জুতো পায়ে দিয়েই জল কেটে এধারে এল। জুতোটা ভিজল, কিন্তু শমিতার সামনে জুতো হাতে করতে বোধ হয় তার ইজ্জতে বাধল।

চৌরাস্তা ছেড়ে গলি। তারপর উপগলি।

যখন বিজিতের মনে হ'ল শমিতা বুঝি আর থামবেই না, তখন শমিতা ফিরে দাঁড়াল।

'এই যে আমাদের বাড়ি। ভাল করে চিনে রাখুন। আমার কাপড়জামা নিয়ে আবার তো আসতে হবে।'

বিজিত দেখল।

জরাজীর্ণ বাড়ি। দুতলা। আদিতে কি রং ছিল বোঝা মুস্কিল। অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে ইটের পাঁজর প্রকট। পাইপের পাশে বট অশ্বত্থের চারা।

বাড়ির সামনে একটা দীপদণ্ড থাকায়, বাড়ির ক্লিন্নরূপ পরিষ্কার দেখা গেল।

'আমি যাই তাহলে?'

বিজিতের কথা শেষ হতেই শমিতা বিস্মিত কণ্ঠে বলল।

'ওমা, চলে যাবেন কি। ভিতরে আসুন। আমার অভিভাবকের কাছে আমায় বুঝিয়ে দিয়ে যান।'

কয়েকবার কড়া নাড়তে পলিতকেশ এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন।

শীর্ণ চেহারা। চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা। হাতে ছোট একটা খাতা।

'হ্যাঁরে খুকি, স্কুলে আটকে পড়েছিলি বুঝি? আমি তো—'

বিজিতের দিকে চোখ পড়তেই বৃদ্ধ থেমে গেলেন।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শমিতার দিকে চোখ ফেরাতে শমিতা বিজিতকে আহ্বান করল,

'আসুন, ভিতরে আসুন।'

ছোট ঘর। কোণে একটা চেয়ার, হাতলহীন। ময়লা মাদুর পাতা। খুব কমজোর বাতি।

বিজিতের মনে হ'ল, চেয়ারে বোধ হয় বৃদ্ধ বসেছিলেন, তাই সে ইতস্তত করে মাদুরের ওপরই বসে পড়ল।

'আমার বাবা।'

শমিতা হাত দিয়ে বৃদ্ধকে দেখাল।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে গিয়েই বিজিত থেমে গেল। তার মনে পড়ল শমিতার পদবি তার জানা নেই। বিজিতরা ব্রাহ্মণ। শমিতারা যদি অব্রাহ্মণ হয় তাহলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা সমীচীন হবে না।

তাই সে দুটো হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার।'

পুরু কাচের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ বিজিতকে জরিপ করে বললেন,

'তোমাকে তো বাবা ঠিক চিনতে পারলাম না।'

শমিতা ঘরের মধ্যে যাচ্ছিল। ফিরে এসে বলল,

'বৃষ্টির সময় এঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, নইলে একেবারে ভিজে যেতাম। দেখ না, এঁর মায়ের শাড়ী ব্লাউজ পরে এসেছি। ব্লাউজটা তিনটে সেফটিপিন দিয়ে আটকাতে হয়েছে। আমার জামা কাপড় উনি পরে নিয়ে আসবেন।'

বৃদ্ধ শ্লথগতিতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

একবার শমিতার দিকে, আর একবার বিজিতের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'অ'। তারপর হাতের বইতে মনোনিবেশ করলেন।

বিজিত ভাবল, বাড়িটা যখন দেখা হয়েছে, তখন এবার সে উঠলেই পারে। আর এখানে অনাবশ্যক বসে থাকার কোন মানে হয় না।

এখনও আকাশ থমথমে। হঠাৎ বৃষ্টি নামা বিচিত্র নয়। বিজিতকে রাস্তায় ভিজতে হবে।

কি আশ্চর্য, সঙ্গে ছাতা আনার কথাটা তার একবারও মনে হয়নি। যা তাড়াহুড়া করে বের হতে হয়েছে।

বিজিত যখন ভাবছে, কাকে বলে বেরিয়ে যাবে, শমিতাকে না তার বাবাকে, তখনই ভিতর থেকে হাই হিল জুতোর শব্দ শোনা গেল। খট, খট, খট।

কে যেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

পুরানো শাড়ীর পর্দা টাঙানো। সেই পর্দাটা খুব জোরে দুলে উঠল।

তারপরই যে বাইরের ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে বিজিত হতভম্ব হয়ে গেল।

পাখির বাসার মতন উঁচু খোঁপা, দু কানে বড় বড় রিং, উগ্র প্রসাধন করা মুখ, গাঢ় রক্তিম ঠোঁট। দুঃসাহসিক ব্লাউজ, চটকদার শাড়ী।

এ পরিবেশে এমন মেয়ে যেন বেমানান।

এক মুহূর্ত বিজিতের দিকে চোখ রেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

তিনি বই থেকে মুখ তুললেন, 'এই দুর্যোগে বেরিয়ে হচ্ছিস।'

'দুর্যোগ বলে রিহার্সাল বন্ধ থাকবে নাকি? এ কি তোমার রেসের মাঠ যে জোর বৃষ্টি হলে ঘোড়া দৌড়াবে না।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। মনে হ'ল প্রতিধ্বনিতে ছোট ঘর ভরে উঠল।

মহিলা দাঁড়াল না। আবার জুতোর শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলল না।

কিছুটা সময় কাটলে বিজিত সাহস করে বলল, 'এবার আমি যাব।'

'যাবেন?' শমিতা অন্যমনস্ক কণ্ঠে কথাটা বলল। খুব মৃদু সুরে। যেন বিজিতকে নয়, নিজেকে বলল।

শমিতার বাবা কিছু বললেন না।

বিজিত বেরিয়ে এল।

রাস্তার মোড়ে এসে দেখল, মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোধ হয় বাসের অপেক্ষায়। কিন্তু না, বিজিতের ভুল হয়েছিল।

মহিলা হাত নেড়ে একটা ট্যাক্সি থামাল, তারপর তার মধ্যে উঠে বসল।

মোটরের লাল পুচ্ছবিন্দু অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বিজিত রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল।

জরাজীর্ণ বাড়ি, বৃদ্ধ শীর্ণ চেহারার শমিতার বাপ, শমিতাকে দেখেও অভিজাত পরিবারের কেউ বলে মনে হয়নি।

কিন্তু জীর্ণ ফ্রেমে এই সুসজ্জিতা মেয়েটির ছবি যেন বেমানান।

ভাগ্য ভাল বিজিতের। বাড়ির মধ্যে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তুমুল বর্ষণ শুরু হ'ল।

আর পাঁচ মিনিট দেরী হ'লে বিজিতকে একেবারে স্নান করে বাড়ি ফিরতে হ'ত।

বিজিতের মা আর বাবা দুজনেই বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন।

বিজিত ঢুকতেই মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,

'কিরে, এত দেরী হ'ল?'

বিজিত হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'বাড়ি কি এখানে নাকি? যেতে আসতেই সময় লেগে গেল।'

মনে হ'ল, বিজিতের বাবা সব কথাই শুনেছেন। তিনি কিছু বললেন না।

'হ্যাঁরে, শমিতার বাড়িতে কাকে দেখলি?'

মা চেয়ারে বসে আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওর বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল। ওরা কি জাত মা?'

'জাত? শমিতারা সরকার। কেন রে?

'আমি ভাবছিলাম, ওর বাবার পায়ের ধুলো নেব কি না।'

বিজিতের বাবা ঠোঁটে পাইপ চেপে জানলার বাইরে দেখছিলেন। বোধহয় বৃষ্টির প্রকোপ।

বিজিতের কথায় মুখ ফিরিয়ে বললেন, আজকাল আর ওসব কেউ মানে না। বয়োজ্যেষ্ঠ হলেই প্রণাম করা চলে। আমরা তো অব্রাহ্মণ অধ্যাপককেও প্রণাম করেছি।'

সারাটা পথ বিজিতের মনে যে চিন্তা ছায়াপাত করছিল, সেটাই এবার সে জিজ্ঞাসা করে ফেলল।

'তোমাদের শমিতার মাকে তো দেখতে পেলাম না। তিনি ঘরের মধ্যে থেকে বাইরেই বের হলেন না।'

বিজিতের মনে একটা একটা চাপা অভিমান ছিল। প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ।

বিজিতের মা শমিতার জন্য এত করলেন, পরণের শাড়ী ব্লাউজ দিলেন, নিজের ছেলেকে পাঠালেন সঙ্গে, অথচ শমিতা তার মায়ের সঙ্গে বিজিতের একবার পরিচয়ও করিয়ে দিল না।

বিজিতের মা ভ্রূ কোঁচকালেন।

'শমিতার মাকে দেখবি কি করে। তিনি তো কবে মারা গেছেন। শমিতারই ভাল করে তাঁকে মনে নেই। শমিতা যখন বছর দুয়েকের তখন তার মা বেরিবেরিতে মারা যান। শমিতার দিদিকে দেখলি না?'

শমিতার দিদি! তাহলে সেই মহিলা কি শমিতার দিদি!

কিন্তু শমিতার সঙ্গে তার মুখের তো কোন মিল নেই। শমিতা কালো না হ'লেও খুব গৌরী নয়, কিন্তু মহিলা রীতিমত ফর্সা। আভরণে আবরণে তাকে অভিজাত পরিবারের বলেই মনে হ'ল।

তাছাড়া, মহিলা রিহার্সালের কথা কি বলল!

ইচ্ছা থাকলেও বিজিতের আর কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হ'ল না।

একটু পরেই তার প্রাইভেট টিউটর আসবেন। তার আগে বই খাতা নিয়ে তাকে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসতে হবে।

কি আশ্চর্য, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দিদির কথাই মনে পড়তে লাগল।

রিহার্সালের কথা আর ঘোড়দৌড়ের মাঠের সঙ্গে তুলনা।

শমিতার বাবার হাতের ছোট বইটার কুলুজিটা বোঝা গেল।

স্কুলে যেতে আসতে গলির চায়ের দোকানে এই রকম ছোট বই হাতে বেশ কয়েকজনকে বিজিত বসে থাকতে দেখেছে।

তার বন্ধুরা বলেছে, এরা সব রেসের পোকা। বসে বসে ঘোড়ার কোষ্ঠী দেখছে। শনিবার কেউ বাজিমাত করবে, কেউ চিৎপাত।

বিজিত শুধু শুনেছে, কোন আগ্রহ প্রক শ করেনি।

শমিতার বাবাকে দেখার পর থেকে সে এ ব্যাপারে যেন একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ল।

রেস খেলতে টাকাব প্রয়োজন হয়। এ একরকমের নেশা। জুয়ার সগোত্র। সর্বস্বান্ত হবার ভয়ও থাকে।

শমিতাদের ঘরের আসবাবপত্রে দীনতার ছাপ। শমিতা৺ বাবা রেস খেলার জন্য পর্যাপ্ত টাকা পান কোথা থেকে ?

কিংবা তিনি রেস খেলেন বলেই হয়তো শমিতাদের এই অবস্থা।

পরের দিন বিকালে বিজিতেব মা এসে দাঁড়ালেন। হাতে একটি প্যাকেট।

পরীক্ষার পড়াব জন্য এখন স্কুল বন্ধ। সারাটা দিন বিজিত পড়াশোনা করেছে। বিকালের দিকে কাছের পার্কে একটু বেড়িয়ে আসবার জন্য তৈরি হাচ্ছিল, এমন সময় মা ডাকলেন.

'বিজিত।'

'মা।'

বিজিত মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

'মেয়েটার শাড়ী আর ব্লাউজ দিয়ে আয় বাবা। এই নে।'

বিজিত হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল, কিন্তু শমিতাদের বাড়ি যেতে তার মোটেই ইচ্ছা করছিল না।

শমিতার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে বেশ হয়, তাহলে আর উজান বেয়ে তাকে শমিতাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হয় না।

চলতে চলতে বিজিত এদিক ওদিক দেখল। ইচ্ছা করেই

উল্টো দিকে রাখীর বাড়ির কাছাকাছি গেল। যদি শমিতা এসে থাকে। তাকে দেখা যায়।

না, শমিতা কোথাও নেই।

বিজিত খুব ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে দরজার কড়া নাড়ল।

তার ধারণা ছিল, সম্ভবত শমিতার বাবাই দরজা খুলে দেবেন।

কিন্তু না, দরজা খুলল কালকের সেই মহিলা।

তবে আজ তার সাজ মোটেই উগ্র নয়। পরণে সাধারণ শাড়ী। এলো খোঁপা। শুধু মুখটা চকচক করছে।

দরজা খুলে মহিলা সরে গেল না। ফলে বিজিতকে চৌকাঠের এপারেই দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

'কে ?'

বিজিত কে এমন একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। এক শমিতা কিংবা তার বাবা ছাড়া আর কে তাকে চিনবে ?

তাই সে বলল,

'শমিতা দেবী আছেন ?'

মহিলার ঠোঁটের দুটি প্রান্ত ব্যঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে এল।

'শমিতা আবার দেবী হ'ল কবে থেকে ? তুমি কে বলতো ?'

বিপদ কাটাবার উদ্দেশ্যে বিজিত হাতের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

'শমিতাকে এই প্যাকেটটা দিয়ে দেবেন।'

'কি আছে এতে ?'

শাড়ী আর ব্লাউজ।

'শাড়ী আর ব্লাউজ !'

মহিলা বিজিতের কথার প্রতিধ্বনি করল।

আবহাওয়া খুব গরম নয়, তবু বিজিতের কপালে ঘামের ফোঁটা জমেছে। তালু শুকিয়ে কাঠ।

একবার ভাবল প্যাকেটটা নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করবে। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়।

'এই যে এনেছেন।'

সেই মুহূর্তে বিজিতের মনে হ'ল শমিতার কণ্ঠ যেন দৈববাণীর সামিল।

সে ঘুরে দাঁড়াল।

শমিতার পরণে বাসন্তী রংয়ের শাড়ী, সেই রংয়েরই ব্লাউজ। হাতে সবুজ মলাটের একটা বই।

'আসুন, আসুন, ঘরের মধ্যে আসুন।'

বিজিতের পাশ কাটিয়ে শমিতা ঘরে ঢুকল।

'না, আমি আর বসব না। আমার প্রাইভেট টিউটর আসবেন।'

'প্রাইভেট টিউটর? কি পড় তুমি?' মহিলা জিজ্ঞাসা করল।

'এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দেব। মাস তিনেক পরে পরীক্ষা।'

মহিলা আর কিছু বলল না। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মনে হ'ল কিছু একটার প্রতীক্ষা করছে।

'আমি চলি।'

বিজিত আবার বলল।

শমিতা বলল, 'দাঁড়ান, আপনার মায়ের শাড়ী ব্লাউজ দিয়ে দিই। একটু বসুন।'

আজ আর মাদুর নেই। জানলার কাছে চেয়ার।

সে চেয়ারে বসা সম্ভব নয়, কারণ তার ধার ঘেঁসে মহিলা দাঁড়িয়ে।

মহিলার আঁচলের কিছুটা চেয়ারের ওপর।

বিজিত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। অস্বস্তিকর নীরবতা। কেবল তার ভয়, এই বুঝি মহিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করে।

শমিতা বাইরে এল। হাতে কার্ডবোর্ডের বাক্স।

'এই নিন। আপনার মাকে আমার প্রণাম দেবেন। জীবনে মাকে পাইনি, মায়ের ভালবাসার স্বাদ জানা নেই, সেইজন্য কাল আপনার মায়ের ব্যবহার এত ভাল লেগেছিল।'

শেষদিকে শমিতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

কি উত্তর দেবে বিজিত ঠিক করার আগেই তার কানে মহিলার চিৎকারের শব্দ এল।

'এই মানুদা, শুনে যাও, কথা আছে।'

ঘাড় পর্যন্ত চুল, গাল জোড়া জুলপি, দীর্ঘ চেহারার একটি যুবক ঘরে ঢুকল।

ঢুকেই একবার বিজিতকে দেখল তারপর মহিলার সামনে গিয়ে বলল।

কি বল নমিতা, এত ডাকাডাকি কেন ?

বিজিত মনে মনে উচ্চারণ করল, শমিতা, নমিতা। তাহলে এই মহিলাই শমিতার দিদি। অথচ চেহারায় কথাবার্তায় কোন মিল নেই।

নমিতা একটু রুক্ষ কণ্ঠে বলল।

আমার টাকার কি করলে বল ?

যুবকটির নাম মানু। এই নামেই নমিতা তাকে ডেকেছিল।

মানু পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড় মুখ মুছে নিল, তারপর বলল।

দাঁড়াও, ক্লাবের যা অবস্থা হয়েছে। চ্যারিটি শো-তে লাভ তো হলই না, উল্টে এক গাদা টাকা লোকসান।

তার জন্য আমার টাকা মারা যাবে ?

আরে না, না, মারা যাবে কেন। দিতে একটু দেরী হচ্ছে। আচ্ছা, আজ না হয় প্রণববাবুকে একবার বলে দেখব।

যে বাবুকে ইচ্ছা বল। টাকাটার আমার কিন্তু খুব দরকার মানুদা।

টাকার আর কার না দরকার বল। আমাদের দরকার নেই ! এই টাকার জন্যই তো ওয়ার্কশপে মেশিনের সঙ্গে লড়ছি।

মানু ঘুরে দাঁড়িয়েই শমিতার দিকে চেয়ে হাসল।

কি শমি, গানের ক্লাশ কেমন হচ্ছে ?

এই তো গানের ক্লাশ করে এলাম।

ভাল, ভাল, গানটা মন দিয়ে শেখ। গানের আজকাল খুব কদর। মানুষ এদিকে খেতে পায় না, অথচ গানের জলসার টিকেট সাতদিন আগেই শেষ। মারপিট লেগে যায়। বলা যায়, একদিন তোমার জন্যও এই রকম ভিড় হবে।

শমিতা বিরক্তিতে মুখ গম্ভীর করে বলল।

আমার জন্য ভিড় হয়ে দরকার নেই মানুদা। আমি নাম করতেও চাই না, জলসায় গান গাইবার শখও আমার নেই।

মানু অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

তাহলে এত কষ্ট করে গান শিখে লাভ ?

লাভ ? মনে যখন খুব অবসাদ আসবে, দুঃখ-কষ্ট আসবে জীবনে, তখন একলা বসে গান গাইব। নিজেকে নিজে গান শোনাব।

মানু শমিতার কথায় এত বিস্মিত হয়ে গেল যে তার মুখে কোন উত্তরই যোগাল না। এ রকম কথা সে বোধ হয় আর শোনে নি; বিশেষত কিশোরী মেয়ের কাছ থেকে।

মানু দরজার কাছে যেতেই নমিতা আবার ডাকল।

শোন মানুদা, আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি।

মানু ফিরল।

কথাটা বলতে গিয়েই নমিতা থেমে গেল। বিজিতের দিকে চোখ রেখে বলল, তোমার কাজ তো হয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে বিজিতের সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। জ্বালা করে উঠল দুটো চোখ। নিজের ওপর তার রাগ হল এভাবে প্যাকেট হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।

একটি কথাও না বলে দ্রুতপায়ে সে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বার বার সে প্রতিজ্ঞা করল, এই শেষ। এ বাড়িতে আর নয়। ভবিষ্যতে আর কোনদিন আসবে না।

একটু পরেই নিজের প্রতিজ্ঞার অযৌক্তিকতার কথাও মনে হ'ল।

এ বাড়িতে তাকে আসতে হবেই বা কেন। শেষ প্রয়োজনে আজ এসেছিল। মায়ের শাড়ী ব্লাউজ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। এ গলিতে ঢোকবার আর দরকার হবে না।

বিজিতের উচিত ছিল অনেক আগেই চলে আসা। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরের কথা শোনা সমীচীন নয়। এ বোধ তার থাকা উচিত।

ওহে শুনছ, ও ছোকরা।

পিছন থেকে কে ডাকছে।

বিজিত দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটি বাড়ির রোয়াকের ওপর শমিতার বাবা। হাতে সেই ছোট বই।

বৃদ্ধ নেমে এসে বিজিতের কাছে দাঁড়ালেন।

এদিকে কোথায় গিয়েছিলে ?

আপনাদের বাড়ি। কথাটা বলেই বিনা প্রয়োজনে যে যায় নি সেটা বোঝাবার জন্য যোগ করে দিল, আমার মায়ের শাড়ী ব্লাউজ নিয়ে আসবার জন্য।

ভাল, ভাল। এদিকে কোথায় থাক ?

পনেরোর বি, চন্দ্রকুমার সেন স্ট্রীট।

নিজের বাড়ি ?

হ্যাঁ।

বেশ। ক'তলা ?

বৃদ্ধের প্রশ্নের যেন আর শেষ নেই।

তু'তলা। কেন বলুন তো ?

এমনই জিজ্ঞাসা করছি।

বৃদ্ধ এদিক ওদিক দেখলেন। রাস্তা জনবিরল। ধারে কাছে কেউ নেই।

তবু ফিস ফিস করে বললেন।

তোমার কাছে একটা টাকা হবে?

কথাটা বিজিত ঠিক শুনতে পায় নি, কিংবা পেলেও বুঝতে পারে নি।

তাই সে প্রশ্ন করল।

কি বললেন?

টাকা, টাকা। একটা টাকা হবে তোমার কাছে। পরশু তোমাকে দু টাকা দিয়ে আসব। তোমার ঠিকানা তো জানলাম। একেবারে বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসব।

সঙ্গে টাকা থাকলে বিজিত হয়তো দ্বিধা করত না। বৃদ্ধকে টাকা দিয়ে দিত। দু টাকা ফেরত পাবার লোভে নয়। এমনই।

এ পর্যন্ত কেউ তার কাছে কোনদিন অর্থসাহায্য চায় নি।

সে বলল আমার কাছে তো টাকা নেই। টাকা কেন, খুচরো পয়সাও নেই। আমি হেঁটে এসেছি, হেঁটেই চলে যাব।

বিজিত স্পষ্ট দেখল, বৃদ্ধের মুখের চামড়াগুলো যেন আরও কুঁচকে গেল। দুটো চোখ ছোট হয়ে এল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

সরে যেতে যেতে বৃদ্ধ বললেন, সঙ্গে টাকাপয়সা রাখবে। একেবারে খালি হাতে রাস্তায় বের হওয়া ঠিক নয়। কখন কি বিপদ হয় ঠিক আছে।

বিজিত যখন বাড়ি ফিরে এল, দেখল তার প্রাইভেট টিউটর অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন।

এমন কোনদিন হয় না। বিজিত পড়ার টেবিলে তৈরি থাকে।

সিঁড়ির চাতালে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কিরে, এত দেরী ?

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বিজিত কার্ডবোর্ডের বাক্সটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে জোর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

পড়তে পড়তে বিজিত বার বার অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ব্যাপারটা প্রাইভেট টিউটরও লক্ষ্য করলেন।

কি শরীর খারাপ নাকি ?

না। শরীর ঠিক আছে।

তবে কি ভাবছ ?

কিছু ভাবছি না তো।

বিজিত বটানির নোটস-এর ওপর ঝুঁকে পড়ল। বটানি তার প্রিয় বিষয়। গাছপালার জীবনতত্ত্ব পড়তে তার খুব ভাল লাগে।

কিন্তু চেষ্টা করেও সে পাঠ্যে মনঃসংযোগ করতে পারল না।

তার দু কানে শমিতার কণ্ঠ বেজে চলেছে।

দুঃখে, অবসাদে যখন ভেঙে পড়বে তখন শমিতা নিজেকে নিজে গান শোনাবে।

এমন কথা বিজিত কোনদিন শোনে নি।

তাহলে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে মা যে গুণ গুণ করে গান করেন, সে কি নিজেকে গান শোনান।

আপাতদৃষ্টিতে মায়ের জীবনে খুব দুঃখ কষ্ট আছে, বিজিতের এমন মনে হয় না।

বাবা এক বড় ফার্মের কেমিস্ট। নিজের মোটর নেই, কিন্তু অফিসের মোটরেই যাওয়া আসা করেন। শান্তির সংসার। মায়ের সঙ্গে বাপের বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে কোনদিন বচসা হয়েছে, বিজিত শোনে নি।

ছোটখাট তর্ক, কথাকাটাকাটি, সে তো সব সংসারেই আছে।

প্রাইভেট টিউটর চলে যেতে বিজিত খাবার টেবিলে গিয়ে বসল।

বাবা বাথরুমে। মুখ হাত ধুয়ে এসে বসবেন।

মা বসে আছেন। তারিণীর মা প্লেট সাজাচ্ছে।

বিজিত আসতে মা বললেন।

মেয়েটা তো আচ্ছা পাগলি।

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বিজিত মায়ের দিকে দেখল।

ইতিমধ্যে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বাবাও এসে বসেছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

কে মেয়ে?

ওই যে শমিতা। বৃষ্টিতে ভিজে সেদিন যে আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছিল।

হুঁ, সে কি করেছে?

আমার শাড়ী ব্লাউজ ফেরত পাঠিয়েছে তার মধ্যে এক চিঠি।

বিজিত চমকে উঠল।

চিঠি! শমিতা চিঠি লিখেছে।

চিঠিতে টাকা চেয়েছে বুঝি?

তার দিদি, বাবা সবাই তো টাকার কথাই বলছিল। সারা সংসার যেন হাত পেতে রয়েছে।

প্লেটগুলো এগিয়ে দিতে দিতে মা বললেন।

লিখেছে আপনার মতন আমার বেশ একটা মা থাকত।

বিজিতের মনে হ'ল মায়ের গলাটা যেন কান্না-ভেজা।

বাবা শুনলেন। তারপর বললেন মায়ের স্নেহ এমনই জিনিস। বিজিতের মনে হ'ল কথাটা বলে বাবা যেন বিজিতের দিকে দেখলেন।

অর্থাৎ মায়ের ভালবাসা কি অসীম সেটা বিজিত উপলব্ধি করুক।

জিনিস থাকতে তো লোকে জিনিসের মর্যাদা বোঝে না।

একটা কাজ কর, বাবা খেতে খেতে বললেন, মেয়েটাকে মাঝে মাঝে নিয়ে এস তোমার কাছে। সারা দিন না হয় থাকবে।

মা হাসলেন, পাচ্ছি কোথায় তাকে। পাড়ার মেয়ে তো নয়।

বিজিত তো বাড়ি চেনে। ডেকে আনতে পারে।

কিছু বলা যায় না, মা বাবা হয়তো বলে বসবেন, সামনের সপ্তাহেই শমিতাকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু বিজিত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, ও বাড়িতে আর নয়।

তাই সে তাড়াতাড়ি বলল।

আমার পরীক্ষা না হয়ে গেলে আমি কোথাও যাব না মা। আমার বড় সময় নষ্ট হয়।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, না, এখন নয়। তোমার পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর।

খাবার টেবিলে আর কোন কথা হল না।

কিছুদিন পর এ বাড়ি থেকে শমিতার নামই মুছে গেল। শমিতা নামের কোন মেয়ে এক দুর্যোগে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, মাতৃস্নেহবঞ্চিত হৃদয় দিয়ে ক্ষণেকের জন্য হলেও এ বাড়ির গৃহিণীকে বশ করেছিল সে কথা সবাই বিস্মৃত হয়ে গেল।

না সকলে নয়। দ্রুততালে পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে শুধু বিজিতের শমিতার কথা মনে হ'ত।

তাও সব সময়ে নয়।

বিকালের দিকে বাইরের ঘরে যখন পড়ার বই নিয়ে বসে থাকত তখন ফেরিওয়ালার সুরেলা চিৎকারে উন্মনা হয়ে পড়ত।

জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখত সিক্তবেশে কোন কিশোরী আশ্রয় প্রার্থনা করছে কি না।

অল্পক্ষণের জন্য, তারপরই পরীক্ষা তার উদ্যত চাবুক হাতে তাড়া করত। স্বপ্নবিলাসের কোন অবকাশই দিত না।

পরীক্ষা শেষ হ'ল।

মন্দ্রাক্রান্তা তালে একদিন খবরও বের হ'ল।

রসায়ন আর জীববিদ্যা দুটোতে লেটার নিয়ে বিজিত প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।

বাড়িতে উৎসবের বন্যা।

বিজিতের বাপের বন্ধুরা অনেকে অনেক পরামর্শ দিলেন।

কেউ বললেন বিদেশে পাঠাতে। এ দেশে শিক্ষার যা অবস্থা তাতে অধ্যয়নশীল ছেলেদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা।

অনেকে বললেন, রসায়নে অনার্স নিয়ে পড়ুক। পাশ করলে বাপের অফিসে ঢুকবে।

বিজিতের বাবা কোন মতামত দিলেন না। শুধু বললেন, বিদেশে না গেলে প্রকৃত পড়াশোনা হয় না, এমন থিয়োরি মানতে আমি রাজী নই। বাইরে যান নি, অথচ কৃতবিদ্য এমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারি। যাক, বিজিতের সঙ্গে এ বিষয়ে একবার কথা বলে দেখি।

বিজিতের সঙ্গে তিনি কথা বললেন একেবারে অন্য বিষয়ে।

বিজিত, ভাবছি ছোট একটা পার্টি দেব। তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের লিস্ট একটা করে দিও আমাকে। আমার অফিসের দু-এক জনকে বলব। আর তোমার?

মায়ের দিকে বিজিতের বাবা ফিরলেন।

মা চেয়ারে বসে কি একটা বুনছিলেন। পায়ের কাছে উলের বল এদিক ওদিক করছিল।

আমি একজনকে বলতে চাই।

একজনকে?

হ্যাঁ শমিতাকে বলব।

শমিতা? ও, আচ্ছা সেই মেয়েটি।

বিজিতের আশ্চর্য লাগল শমিতাকে মা এখনও মনে রেখেছেন।

ঠিক আছে। দিন ঠিক হলে বিজিত গিয়ে বলে আসবে।

দিন স্থির হ'ল। এক শনিবার। সবশুদ্ধ জন দশেক।

ছাদের ওপর প্যাণ্ডেল বেঁধে খাবার আয়োজন।

দুদিন আগে মা বিজিতকে বললেন।

বিজিত যা বাবা শমিতাকে একবার বলে আয়। আমার নাম করে বলবি।

শমিতাদের বাড়ি যাবার ইচ্ছা বিজিতের বিশেষ ছিল না। বিশেষ করে যখনই শমিতার দিদি নমিতার কথা মনে পড়ছিল তখনই বিজিতের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল।

এমন একটা বাড়িতে পা দিতেই বিজিতের ইচ্ছা করছিল না।

কিন্তু সে নিরুপায়। মা বাপের নির্দেশ না মানার শিক্ষা সে পায় নি। কাজেই তাকে বের হতেই হ'ল।

শমিতাদের বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই বিজিতের বিচিত্র এক অনুভূতি হ'ল।

তার প্রথম মনে হ'ল, শমিতাকে সে কতদিন দেখে নি। তাকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তার বুক জুড়ে উঠল।

শমিতা তো কিছু করে নি। তার বাবা বা দিদির মতন পয়সার কোন প্রশ্ন তোলে নি। বরং বিজিতের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছে।

বিজিত কড়া নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল।

কে?

বিজিতের একবার মনে হ'ল বোধহয় শমিতারই কণ্ঠস্বর, কিন্তু কণ্ঠ যেন একটু ভারি।

আমি বিজিত।

বিজিত উত্তর দিয়েই ভাবতে লাগল যদি দরজার ওপারে শমিতার বদলে নমিতা এসে দাঁড়ায় তাহলে সে কি করবে।

শমিতার নিমন্ত্রণের কথাটা বলেই দ্রুতপায়ে চলে আসবে। এ ছাড়া সে আর কিই বা করতে পারে।

শমিতা এসে দাঁড়াল।

কিন্তু এ শমিতার সঙ্গে বিজিতের কোন পরিচয় নেই। এই ক মাসে শমিতা এত বড় হয়ে গেছে।

পরণে আধ ময়লা শাড়ী, রুক্ষ চুল, উদাস দুটি চোখের দৃষ্টি।

বিজিত খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, আমার পরীক্ষায় পাশ করার উপলক্ষে বাড়িতে একটা পার্টি হচ্ছে পরশু সন্ধ্যায়। মা বিশেষ করে আপনাকে যেতে বলে দিয়েছেন।

শমিতা একটা হাত দরজার কবাটে রেখে দাঁড়াল। দু-এক মুহূর্ত বুঝি বিজিতকে দেখল, তারপর বলল আপনার পাশের খবরে খুব খুশী হয়েছি, কিন্তু আমার তো যাবার উপায় নেই।

উপায় নেই?

না। এক বছর আমাদের কোন নিমন্ত্রণে যেতে নেই। আজ পাঁচ দিন হ'ল আমার বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন!

বিজিত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তার নেই। একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জীবন থেকে সরে গেলে কি মর্মন্তুদ অবস্থা হয় সেটা জানবার সুযোগ তার ইতিপূর্বে হয় নি।

তবু মৃত্যু কি, সেটা সে জানে।

বিশেষ করে একটা পরিবারের একমাত্র পুরুষ যদি চিরদিনের জন্য মুছে যায়, তাহলে সে পরিবারের অন্য সবাই কি দুর্বিপাকে পড়ে সেটা উপলব্ধি করার মতন জ্ঞান তার আছে।

কিছু একটা বলা উচিত এই ভেবেই সে প্রশ্ন করল।

কি হয়েছিল?

বাস দুর্ঘটনা।

বাস দুর্ঘটনা?

হ্যাঁ জীবনে প্রথম টাকা জিতে বাবা রেস থেকে বাসে বাড়ি ফিরছিল। পকেটে পাঁচশো টাকা। আনন্দে জ্ঞান ছিল না। বাস থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে একেবারে চাকার তলায়।

কি আশ্চর্য নিজের বাপের মৃত্যুর বিবরণ শমিতা এমনভাবে দিচ্ছে, এমন নিরাসক্ত কণ্ঠে, মনে হল যেন খবরের কাগজের পাতা থেকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছে।

তারপর স্বাভাবিকভাবে বিজিতের মনে যে প্রশ্ন এল সেটাই সে জিজ্ঞাসা করল। শমিতার বাবা কোথায় কাজ করতেন আদৌ উপার্জন করতেন কিনা সেটা তার জানা ছিল না।

এখন কি হবে?

কিসের কি হবে?

শমিতা এতক্ষণে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

মানে, বিজিত ঢোক গিলল, সংসারের।

মনে হ'ল এ কথাটা শমিতাও ভেবেছে। কোন কূলকিনারা পায় নি।

আমার দিদি উপায় করে, তাতেই চলবে।

বিজিত আর প্রশ্ন করে নি। চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, শমিতা আবার বলল, কি হবে আমি জানি না। ভাবতে পারছি না।

আমি চলি।

বিজিত নেমে এল।

শমিতা চৌকাঠ পার হয়ে এপারে এসে দাঁড়াল।

আপনার মাকে বলবেন আমার অবস্থার কথা। নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন।

ঘাড় নেড়ে বিজিত এগিয়ে গেল। বন্ধুদের নিমন্ত্রণ শেষ। একেবারে শেষে শমিতার কাছে এসেছিল। শমিতাকে নিমন্ত্রণ

করার ইচ্ছা তার ছিল না। সে একথা ভাবেও নি। শুধু মায়ের নির্দেশ পালন করতে এসেছিল।

এখন কিন্তু খারাপ লাগছে।

তার সাফল্যের আনন্দটুকু শমিতা নিজের বেদনা দিয়ে যেন মুছে দিল।

রাস্তার মাঝামাঝি এসে বিজিত থমকে দাঁড়াল।

ঠিক এইরকম জায়গায় শমিতার বাবা তাকে ডেকেছিলেন।

একটা টাকা ধার চেয়েছিলেন। পারলে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

আজ লোকটা হিসাব-নিকাশের ঊর্দ্ধে। আর কোনদিন কোন কামনা প্রার্থনা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

বিজিত বাড়ি গিয়ে দেখল, মা আর বাবা দুজনেই ব্যস্ত।

ডেকরেটরের লোক এসেছে। কিভাবে ছাদে প্যাণ্ডেল হবে, তারই আলোচনা।

বিজিত নিজের ঘরে চলে গেল।

শার্টটা খুলে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

খুব ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত বোধ হচ্ছে।

চারদিকে অন্ধকার নেমেছে। ঘরে আলো জ্বালা হয় নি। উঠে আলো জ্বালবে, বিজিতের তাও ইচ্ছা করল না।

শমিতাকে যেন অন্যরকম দেখাল। শোক মানুষকে বদলে দেয়। কোথায় কোন গল্পে বিজিত পড়েছিল, স্বামীকে হারিয়ে রাতারাতি এক স্ত্রীর মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল।

কেন এ রকম হয়?

শোকে, না চিন্তায়!

বিজিত।

মায়ের গলা।

কি মা?

বিজিত বিছানার ওপর উঠে বসল

মা খাটের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কিরে অবেলায় শুয়ে আছিস। শরীর ভাল তো?

দাঁড়াও মা, আলোটা জ্বেলে দি।

বিজিত খাট থেকে নামবার আগে মা-ই বাতি জ্বালিয়ে দিলেন।

বিজিত বলল।

শরীর ভালই আছে মা। একটু ক্লান্ত লাগছিল।

তাহলে একটু শুয়েই থাক না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

না, না, মাথায় হাত বুলোতে হবে না। আমি ঠিক আছি।

মা খাটের ওপর বসলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন।

শমিতাদের বাড়ি গিয়েছিলি? কিছু বলল?

গিয়েছিলাম মা। শমিতা আসতে পারবে না।

আসতে পারবে না?

না, দিন কয়েক হ'ল ওর বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন!

হ্যাঁ, বাস দুর্ঘটনায়।

আহা হা। মেয়েটার মা আর বাবা দুই-ই চলে গেল। তাহলে ওদের সংসারের কি অবস্থা হবে। কে চালাবে?

তাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল, ওর দিদি চালাবে।

ওর দিদি বুঝি চাকরি করে। কই সেদিন তো সেরকম কিছু বলে নি। বলেছিল, বাপের পেনসনই ভরসা।

আর কোন কথা হ'ল না। মা আর ছেলে দুজনেই চুপচাপ।

একটু পরে নিশ্বাস ফেলে মা উঠে গেলেন।

যাবার সময় বলে গেলেন, খাবার টেবিলে আয়, চা দিতে বলছি।

বিজিতের ধারণা ছিল জন দশেক লোক হবে, কিন্তু আসলে হল অনেক বেশী।

বিজিতের বাবার অফিসের সহকর্মীরা অনেকেই এলেন। সস্ত্রীক, ছেলেমেয়ে সমেত।

এ উৎসবের মধ্যমণি বিজিত। বন্ধুরা ছাড়া আর সবাইও তাকে খুঁজল।

একটি মহিলা বিশেষ করে অনেকক্ষণ বিজিতের সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। বাবার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কমল গাঙ্গুলী। তাঁর স্ত্রী।

ভদ্রমহিলার বয়স বিজিতের মায়ের মতনই হবে। কিছু বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু উগ্র প্রসাধনে নিজেকে সাজাবার কি উদ্ভট প্রচেষ্টা।

বিজিত আগেই শুনেছিল, কমলবাবুর এক ছেলে, এক মেয়ে।

ছেলেটি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বিলেত গিয়েছিল। আর ফিরে আসে নি।

পাশ করে সেখানেই চাকরিতে ঢুকেছে। শুধু চাকরি নয়, সংসারও পেতেছে ও দেশের মেয়েকে নিয়ে।

প্রথম প্রথম বাড়িতে কিছু জানায় নি। লিখেছিল, স্নাতকোত্তর একটা ডিগ্রির চেষ্টা করছে। ফিরতে দেরী হবে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

বছর দুয়েক পর একটা ফটো পাঠিয়েছিল। একার নয়, সঙ্গে বিদেশী মেয়ে জেন, মাঝখানে ছেলে উইলি। পরিপূর্ণ সংসারের ছবি।

কমলবাবু প্রথম প্রথম ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান নি। রাখেনও নি। প্রচ্ছন্ন অভিমানে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

বেশীদিন সেটা সম্ভব হয় নি।

নিজেই চিঠি লিখে আবার যোগাযোগ করেছেন। ছেলেকে ভারতবর্ষে আসতে লিখেছিলেন। ছেলে আসে নি।

মেয়ের নাম কণি।

বোধ হয় আসল নাম কণিকা। নিজেই সেটা ছেঁটে ছোট্ট করে নিয়েছে।

অবশ্য এতে পরোক্ষভাবে মায়ের সমর্থনও ছিল।

মেয়ের প্রসাধনও মায়ের মতন।

বয়স পনের ষোলর বেশী নয়। বব্‌ড চুল। চোলি প্যাটার্ন ব্লাউজ। কথার সুরও অস্বাভাবিক। পড়ে লরেটো কনভেণ্টে।

এস বিজিত, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আলাপ আর করিয়ে দিতে হয় নি। কণিই ঝাঁপিয়ে পড়ে আলাপ করেছিল।

আপনি তো পরীক্ষায় খুব ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করেছেন। কি করবেন এখন?

বটানিতে অনার্স নিয়ে পড়ব।

এখানে?

হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সিতে।

বাইরে যাবেন না? আপনার মতন ছেলের তো বাইরে যাওয়া উচিত।

বিজিত খুব মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল।

বাইরে যাবার আমার খুব ইচ্ছা নেই। এখানেও নামকরা অধ্যাপকরা আছেন। এদের কাছে পড়তে পারাও খুব ভাগ্যের কথা।

কণি কিছুক্ষণ কোন কথা বলে নি। বলতে পারে নি। অদ্ভুত কোন প্রাণী দেখছে চোখ মুখের এমনই ভঙ্গী করে বিজিতকে দেখছিল।

আপনার কিন্তু ইউ কে-তে কোন কষ্ট হবে না। আমার দাদাকে লিখে দিলেই সে সব ভার নেবে। তাই না মা?

সমর্থনের আশায় মুখ ফিরিয়েই কণি দেখল, মা পাশে নেই। কখন সরে গেছেন।

আপনি বসুন, আমি একটু ওদিকটা দেখি।

কণিদের টেবিল থেকে বিজিত অন্যদিকে সরে গিয়েছিল।

একেবারে বিদায় নেবার সময় আবার দেখা হয়েছিল।

কমলবাবুর স্ত্রী বলেছিলেন।

কণি, তোমার বিজিতদাকে একদিন যেতে বলেছ?

ছোট চৌকো রুমাল বের করে কপালের কল্পিত ঘাম মুছতে মুছতে কণি বলেছিল, তুমি বল মা। আমি বললে হয়তো উনি যাবেনই না।

কমলবাবুর স্ত্রী এগিয়ে এসে বিজিতের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন। একদিন যাবে কিন্তু। আমাদের ঠিকানা ফোন-গাইডেই পাবে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই বিজিত নীচু হয়ে কমলবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করতে যেতেই মহিলা পিছনে সরে গেলেন।

আমাকে প্রণাম করতে হবে না। আজকাল ওসবের চল নেই। যাবে, কেমন?

বিজিত দাঁড়িয়ে রইল। কিঞ্চিৎ বিমূঢ়।

আজকাল প্রণামের প্রচলন নেই এমন কথা বিজিত এই প্রথম শুনল। কেউ তাকে এর আগে এ কথা বলে নি।

কি হয় প্রণাম করলে? মেরুদণ্ড বেঁকে যায়?

বিজিত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হ'ল।

তার বাবাও এই কলেজে পড়েছেন। এ কলেজের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য।

ইদানীং অবশ্য সে যুগের মত খ্যাতনামা অধ্যাপকরা নেই, কিন্তু যাঁরা আছেন, তাঁরাও যথেষ্ট প্রথিতযশা।

নতুন জীবন বিজিতের খুব ভাল লাগল।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে বিজিত টেবিলে বই গুছিয়ে রাখছিল। মা এসে দাঁড়ালেন।

বিকালে কোথাও বের হবার আছে বিজিত ?

বিকালে ? না মা। কেন ?

আমাকে একটু নিয়ে যাবি ?

কোথায় ?

শমিতাদের বাড়ি। খবরটা যখন শুনলাম তখন একবার যাওয়া উচিত। অবশ্য একটু দেরীই হয়ে গেল।

বিজিতের আশ্চর্য লাগল। মা যাবেন শমিতাদের বাড়ি ! মাত্র একদিনের পরিচয়, তাও কত অল্পক্ষণের জন্য। এর মধ্যে শমিতা কি করে অচ্ছেদ্য বাঁধনে মাকে বাঁধল।

মাকে নিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে বিজিতের প্রথম মনে হ'ল শমিতাকে দেখবার জন্য তার মনও যেন বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

তার পক্ষে একলা শমিতার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মায়ের কল্যাণে দেখা হয়ে যাবে।

রাস্তার মোড়ে এসে বিজিতের মা বললেন।

একটা রিক্সা ডাক বিজিত। এতটা পথ আমি হাঁটতে পারব না।

পথ যে অনেকটা সেটা তিনি বিজিতের কাছেই শুনেছিলেন।

রিক্সা কেন, একটা বরং ট্যাক্সি ডাকি।

না, না, বিজিতের মা হাত নাড়লেন, ট্যাক্সি চড়ে ওদের দরজায় নামতে চাই না। হাঁটতে পারলেই ভাল হ'ত, কিন্তু ইদানীং বাতে বড় কষ্ট দিচ্ছে।

বিজিত আর কথা বাড়াল না।

কাছেই চায়ের দোকানের সামনে রিক্সার জটলা। সেখান থেকে একটা রিক্সা ডেকে আনল।

দুজনে উঠে বসতে রিক্সাচালক জিজ্ঞাসা করল।

কোথায় যাবেন বাবু ?

উত্তর দিতে গিয়েই বিজিত বুঝতে পারল, শমিতাদের বাড়ির

নম্বর, গলির নাম কিছুই তার জানা নেই। দুবার গিয়েছে। একবার শমিতার সঙ্গে, আর একবার একলা, কিন্তু কোনবারই এসব খোঁজ করে নি।

তাই সে বলল, তুমি চল, আমি বলে দিচ্ছি।

এ গলি ও গলি ঘুরে শমিতাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে বিজিত মাকে বলল, আমরা এসে গেছি মা। ওই যে কোণের বাড়িটা। ইঁট বেরিয়ে রয়েছে।

মা মুখে কিছু বললেন না। বাড়িটা একবার শুধু দেখলেন।

তারপর আঁচলের তলা থেকে একটা বাক্স বের করে কোলের ওপর রাখলেন।

বুঝতে পেরেও বিজিত প্রশ্ন করল।

. কি মা?

মা বললেন, মেয়েটার জন্য কটা সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছি। একেবারে খালি হাতে যাব।

বাড়ির সামনে রিক্সা থামল।

বিজিত বলল, রিক্সাটা এখানেই থাক মা। তোমার তো বেশী দেরী হবে না।

না দেরী হবে কেন। থাক রিক্সা।

দুজনে নামল। বিজিত কড়া নাড়ল।

সে ভেবেছিল দরজা খুললেই সে একপাশে সরে দাঁড়াবে। শমিতা কিংবা তার দিদি যেই খুলুক, মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ভিতরে পদশব্দ শোনা গেল।

দরজা খুলতে কেউ এগিয়ে আসছে।

বিজিত সরে এল একধারে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠ, কে?

পরণে ফতুয়া, কোঁচার খুঁট উল্টে পেটে গোঁজা। কাঁচা-পাকা গোঁফ, বিরলকেশ মাথা, একটি প্রৌঢ়।

বিজিতের মনে হ'ল বোধ হয় শমিতাদের কোন অভিভাবক-স্থানীয় আত্মীয়। বিপদের সময় এসে উঠেছেন।

প্রৌঢ় একবার বিজিত, আর একবার তার মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই আপনাদের ?'

বিজিতই বলল, 'শমিতাকে দরকার।'

প্রৌঢ় ভ্রূ কোঁচকালেন, 'হরিহর সরকারের মেয়ে ? হরিহরবাবু তো মারা গেছেন। ওঃ, মরে ভদ্রলোক জ্বালা জুড়িয়েছেন। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে—'

বাধা দিয়ে অতিষ্ঠকণ্ঠে বিজিতের মা বললেন, 'দয়া করে শমিতাকে যদি একটু ডেকে দেন। আমরা এখনই চলে যাব।'

প্রৌঢ় অসহায়ভাবে হাত দুটো ঘোরালেন।

'শমিতাকে আমি পাব কোথায় ? তারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এ ছাড়া তাদের উপায়ও ছিল না। আমার ছ মাসের বাড়িভাড়া বাকি। অন্য বাড়িওয়ালা হ'লে নালিশ মকর্দমা করত। আমি সে সব করি নি। উঠে যেতে বলেছি।'

বিজিত বলতে চায় নি, হঠাৎই তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

'শমিতার দিদি তো উপায় করেন।'

'উপায় ?' প্রৌঢ় শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতে চায় না।

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, 'উপায়ই বটে। মেয়েটা তো অ্যামেচার ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়ায়। কোন কোন রাতে বাড়িই ফিরত না। বুঝতেই পারছেন সব।'

প্রৌঢ়ের কথা শেষ হবার আগেই বিজিতের মা নেমে রিক্সায় গিয়ে উঠলেন।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিজিত চলে এস।'

বিজিত রিক্সায় এসে বসল।

রাস্তায় বিজিতের মা একটি কথাও বললেন না।

বিজিত আড়চোখে মায়ের দিকে দেখল।

মায়ের মুখ থমথম করছে। মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরছেন।

মনে হল, খুব কষ্টে মা যেন নিজেকে সংযত করছেন।

মায়ের এমন রূপ বিজিত এর আগে কখনও দেখেনি।

গলির মধ্যে ঢোকবার মুখে মা এক আশ্চর্য কাজ করলেন।

মোড়ে একটা ডাস্টবিন। আবর্জনা উপচে রাস্তায় পড়ছে।

বিজিতের মা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সন্দেশের বাক্সটা ছুঁড়ে দিলেন।

ডাস্টবিনের কোণে লেগে সন্দেশের বাক্স ছিঁড়ে গেল। সন্দেশগুলো রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

গোটা তিনেক কুকুর কোথায় ওৎ পেতে ছিল। ছুটে এল। কলরবে এলাকাটা মুখর করে তুলল।

বিজিত একটি কথাও বলল না।

রিক্সা থামতেই মা নেমে হন হন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

রিক্সা চালককে ভাড়া দিয়ে বিজিত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়িওয়ালা নমিতার কথা বললেন। তার সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করলেন, সেটা যে বিজিত একেবারেই বোঝে নি, এমন নয়।

জীবনের গোপন রহস্যের সব তত্ত্বের কথা তার জানা নেই, কিন্তু কিছু কিছু বোঝে বৈ কি।

যা ঘটে গেল, এরপর এ বাড়িতে শমিতার নামও যে উচ্চারিত হবে না, সেটা বুঝতে বিজিতের অসুবিধা হ'ল না।

শমিতার সম্বন্ধে অবশ্য কোন কথা শোনা যায় নি। বাড়িওয়ালাও কিছু বলেন নি। কিন্তু শমিতা নমিতার বোন, এটাই তার অপরাধ।

বেশ কয়েক মাস কাটল।

নতুন জীবন নতুন সহপাঠীদের নিয়ে বিজিতের এক অন্য ভুবন।

নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সে ঠিক করে ফেলেছে।

উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করবে। এদেশে কিংবা বিদেশে।

কলেজ শেষ করে বিজিত রোজই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে চলে যায়। অনেকক্ষণ ধরে পড়াশোনা করে। এই পরিবেশ বিজিতের খুব ভাল লাগে।

চারদিকে বই আর বই। জ্ঞানের অপরিমিত ভাণ্ডার।

সেদিন লাইব্রেরি থেকে ফিরে বিজিত দেখল বাড়ির সামনে ফিকে সবুজ রংয়ের একটা ফিয়াট।

সম্ভবত বাবার কোন বন্ধু এসেছেন।

ওপরে উঠতেই মায়ের সঙ্গে দেখা হল।

তিনি হেসে বললেন, 'এত দেরী হ'ল তোর। কণি কতক্ষণ ধরে বসে আছে।'

কণি—

নামটা কবে যেন শুনেছিল বিজিত ঠিক মনে করতে পারল না।

তবু মাকে জিজ্ঞাসা করল।

কণি কে মা?

সেই যে পার্টিতে এসেছিল। তোমার বাবার বন্ধু কমলবাবুর মেয়ে।

ও। এইবার বিজিতের মনে পড়েছে।

সেদিনের উগ্র প্রসাধনে সজ্জিতা সেই মেয়েটি।

যে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বিজিতের সঙ্গে কথা বলেছিল।

নিজের পড়ার ঘরে পা দিয়েই বিজিত থমকে দাঁড়াল।

বারান্দায় কণি। এদিকে পিছন ফিরে, তাই বিজিতকে দেখতে পেল না।

কণির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিজিত একটু জোরেই বলল।

'কতক্ষণ এসেছেন ?'

কণি ফিরে দাঁড়াল।

পরণে সাদা শিফন, দামী সাদা ব্লাউজ। হাতে, গলায় আইভরির অলঙ্কার। সবই সাদা, দুটি ঠোঁট শুধু প্রবাল-লাল।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে বাত হবার যোগাড়। এতক্ষণ কলেজে থাকেন ?'

হাতের বই খাতাগুলো বিজিত টেবিলের ওপর রাখল।

আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে বলল।

এতক্ষণ যখন অপেক্ষা করেছেন, আর একটু করুন। মুখটা ধুয়ে আসি।

মুখ হাত ধুয়ে বিজিত ফিরে এল, দেখল কণি একটা চেয়ার টেনে বসেছে। পায়ের ওপর পা রেখে।

বিজিত খাটের ওপর বসল।

কণির আগের প্রশ্নের জের টেনে বলল।

কলেজ থেকে রোজ ন্যাশনাল লাইব্রেরি চলে যাই। সেখানে কিছুক্ষণ বইপত্র উল্টে পাল্টে তারপর বাড়ি ফিরি।

কপট বিস্ময়ে কণি দুটো চোখ বিস্ফারিত করল।

'ও গড, আর কারও জন্য আপনি কিছু রাখবেন না। জ্ঞানের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করবেন।'

'কি যে বলেন,' বিজিত লজ্জা জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'কত কিছু জানবার আছে। মনে হয় জানবার পক্ষে এক জন্ম যেন যথেষ্ট নয়।'

'জন্ম জন্ম আপনারা জ্ঞান অর্জন করুন, আমার কিছু বলার নেই। সামনের শনিবার সময় হবে আপনার ?'

'শনিবার ? কেন, কি ব্যাপার ?'

'খুবই সামান্য। সক্রেটিস কিংবা প্লেটোর জন্মবার্ষিকী নয়। কণি গাঙ্গুলীর জন্মদিন। সামান্য একটু আয়োজন করা হবে। তারিখটা বরং ডাইরিতে লিখে নিন।'

'না, না, লিখতে হবে না। আমার খুব মনে থাকবে।'

কণি উঠে দাঁড়াল।

তখনই বিজিতের মনে পড়ে গেল।

'আরে বসুন, বসুন, চা খেয়ে যাবেন।'

'আপনার মা কি আর আপনার অপেক্ষায় আছেন, অনেক আগেই খাইয়ে দিয়েছেন। চলি।'

বিজিত কণির সঙ্গে নামল।

মা নীচের ঘরেই ছিলেন। কণি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা বলল। তারপর বাইরে চলে এল।

পিছন পিছন বিজিত।

ড্রাইভার মোটরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সরে এসে দরজা খুলে দিল।

কণি মোটরের মধ্যে বসে জানলা দিয়ে হাত নাড়ল।

'যাবেন কিন্তু। ভুল যেন না হয়। বাই, বাই'

বিজিত ঘরের মধ্যে চলে এল।

মা কৌচে বসে আছেন।

সামনের কৌচে বিজিত বসল।

'নিমন্ত্রণ সন্ধ্যাবেলা, তাই না মা?'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলাই। রাতের খাওয়া তো।'

'শনিবার তো আবার বাবার অফিসে মিটিং থাকে। আসতে দেরী হয়।'

মা মুখ তুলে কিছুক্ষণ বিজিতকে দেখলেন, তারপর বললেন।

'নিমন্ত্রণ তো আমাদের নয়। শুধু তোর।'

বিজিত অবাক!

'শুধু আমার! আমি একলা যাব ওদের বাড়ি?'

'তাই তো যাবি। কণির জন্মদিন। তাই শুধু তোকে বলেছে। তোদের বয়সী ছেলেমেয়েরাই আসবে।'

বিজিত আর কিছু বলল না।

চিরকালই সে মুখচোরা। যেখানে যায় মা-বাপের সঙ্গে।

ইদানীং কলেজে ঢুকে তবু একটু কথাবার্তা বলে। তাও পুরুষদের সঙ্গে। মেয়ে দেখলে সাত হাত দূর দিয়ে যায়।

তবু কণির সঙ্গে কথা বলেছে, কারণ কণি একলা ছিল। এর আগে একদিন তাকে দেখেছিল।

কিন্তু শনিবার ভীড়ের মধ্যে বিজিত কি করে যাবে।

বিজিত মনে মনে হিসাব করল, শনিবারের এখন বেশ কয়েকদিন দেরী আছে। এর মধ্যে জ্বরজারি কিংবা মাথা ধরা কিছু একটা হলে বেঁচে যাবে।

সব চেয়ে অসুবিধার কথা, বিজিতের শরীর খারাপ প্রায় হয়ই না।

শনিবার সকালেই মা মনে করিয়ে দিলেন।

'আজ তো তোর ক্লাশ নেই?'

বিজিত হাতটা কপালে রাখল। বলল।

'থাকলেও যেতে পারতাম না।'

'কেন রে?'

'গা-টা যেন একটু গরম গরম ঠেকছে।'

'গরম ঠেকছে? ওমা সেকি।'

মা ছুটে এসে বিজিতের গাল কপাল ছুঁয়ে দেখলেন। তারপর বিজিতের দিকে চোখ ফিরিয়েই হেসে ফেললেন।

'তুই কি রে?'

'কেন?'

'কণিদের বাড়ি না যাবার ফন্দী আঁটছিস?'

বিজিত চুপ করে রইল।

'তোর অসুবিধাটা কোথায়?'

'ভীড়ে আমার ভাল লাগে না মা।'

'কাজের বাড়িতে ভীড় হবে না? তোর বয়সী ছেলেরা লোকের সঙ্গে মিশতেই তো ভালবাসবে। তোর বাবা আবার ভাবছিলেন, তোকে বিলেত পাঠাবেন। সেখানে তো অচেনা লোকের ভীড়। তাও বিদেশী।'

বিজিত বুঝল এ নিমন্ত্রণ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই।

সারাটা দিন মনকে বোঝাল, ভয়ের কি? সে তো আর বিনা নিমন্ত্রণে যাচ্ছে না। যাবে, খাবে, চলে আসবে, ব্যস। বেশী কথা না বললেই হ'ল।

বিকালের দিকে আবার মা এসে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁরে যাচ্ছিস যে, কণির জন্মদিনে কি দিবি? একেবারে খালি হাতে যেতে আছে?'

সর্বনাশ, উপহারের কথাটা তার একবারও মনে পড়ে নি!

যত বাজে হাঙ্গামা।

এই জন্যই তো সে যেতে চায় নি।

আলমারি খুলে মা একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বের করলেন। তারপর বাক্সর ডালাটা খুলে ফেললেন।

গোলাপী নাইলন। সঙ্গে ব্লাউজের কাপড়।

'নে এই কার্ডটার ওপর কণি আর তোর নামটা লেখ।'

বিজিত কলম বের করে সাবধানে লিখল।

কণি গাঙ্গুলীর জন্মদিনে। বিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর তারিখ দিল।

ঠিক বের হবার মুখে বিজিত আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মা, ওমা।'

মা পাশের ঘরেই ছিলেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'কিরে রুমাল নিস নি বুঝি।'

রুমাল নিতে বিজিতের প্রায়ই ভুল হয়। কিন্তু আজ সে নিয়েছে।

পকেটে হাত দিয়ে বলল।

'না, রুমাল নিয়েছি।'

'তবে?'

'জন্মদিনে কণি তো কোন কার্ড করে নি। ওদের ঠিকানা?'

কপট হতাশায় মা নিজের কপাল চাপড়ালেন।

'সর্বনাশ, ঠিকানা না জেনেই তুই হন হন করে চলে যাচ্ছিস? ঠিকানা তোর বাবা পড়ার টেবিলে বই চাপা দিয়ে রেখে গেছেন। দাঁড়া, আনিয়ে দিচ্ছি।'

মা ভিতরের দিকে মুখ করে চেঁচালেন।

'তারকের মা, দাদাবাবুর পড়ার টেবিলে নীল রংয়ের একটা কাগজ আছে, নিয়ে এস তো।'

তারকের মা কাগজ নিয়ে এল।

বিজিত দেখল তাতে লেখা আছে, কমল গাঙ্গুলি, সতেরো, প্রিটোরিয়া স্ট্রীট।

বিজিত জানে পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি। খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

দুরু দুরু বুকে সে বেরিয়ে পড়ল।

প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে যখন বিজিত গিয়ে পৌঁছাল তখন দিন আর রাত্রির সন্ধিলগ্ন। মনোরম গোধূলি।

কিন্তু এ অঞ্চলে রাত্রির প্রবেশ নিষেধ।

নিওনের আলোর বন্যায় সব কিছু দিনের মতন উজ্জ্বল।

সতের নম্বর বাড়ির সামনে ইতিমধ্যেই মোটরের ভীড়।

বিরাট অট্টালিকা।

সদরে দারোয়ান।

কমল গাঙ্গুলীর খবর জিজ্ঞাসা করতেই সে সেলাম করে বলল, 'তিন তলা। চলা যাইয়ে লিফ্‌ট পর।'

বিজিত লিফ্‌ট-এ উঠল।

তিন তলার কাছাকাছি আসতেই ইংরেজী বাজনা কানে ভেসে এল। অর্কেস্ট্রা।

লিফ্‌ট থামতেই গুটি তিনেক তরুণী ছুটে এল, বিজিতকে দেখে সরে দাঁড়িয়ে বলল, না, না কাপুর নয়। মোহনের আসতে হয়তো রাত হবে।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। বোঝা গেল এরা মোহন কাপুরের জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

তবু বিজিতের মনটা কুঁকড়ে গেল। এমন পরিবেশে সে যেন অবাঞ্ছিত।

'হ্যালো বিজিত।'

ঘরের মধ্যে থেকে চীৎকার করে কণি এগিয়ে এল।

শাড়ী নয়, সে সিল্কের সালোয়ার কামিজ পরেছে। কাঁধে দোপাট্টা।

কণির শরীরের দিকে বিজিত বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারল না।

এত বিশ্রীভাবে কণি সেজেছে!

আবরণ, আভরণ মানুষকে অশালীন করে তুলবে কেন?

বিজিত কিছু না বলে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা কণির হাতে তুলে দিল।

'কি আশ্চর্য, আপনি আসুন তো আগে।'

তারপর কাণ্ড যা করল তার জন্য বিজিত মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। দু কানে ঝিঁঝিঁর অশান্ত আওয়াজ।

কণি বিজিতের একটা হাত জাপটে ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

বিরাট হলঘর। একপাশে প্রকাণ্ড পালিশ-চকচকে একটা টেবিল। তার ওপর উপহারের স্তূপ।

বিজিত কার্ডবোর্ডের বাক্সটা তার ওপর নামিয়ে রাখল।

এদিকে সারি সারি চেয়ার। কেউ কেউ বসে অর্কেস্ট্রা শুনছে। অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিজিতকে একটা চেয়ারের সামনে নিয়ে গিয়ে রুণি বলল, 'বসুন আপনি। আমি গেস্টদের দেখি।'

রুণি সরে যেতেই একটা বেয়ারা এসে হাজির হল।

সফ্‌ট ড্রিংক্স স্যর।

বিজিত চমকে উঠল।

ড্রিংক্স! ড্রিংক্স-এর কথা কি বলল?

বেয়ারা বোধ হয় বুঝতে পারল, তাই আবার বলল।

কি দেব স্যার, পাইন-অ্যাপেল, ক্রিম সোডা, জিঞ্জার বিয়ার।

বিজিত হাত নেড়ে বারণ করল। না, তার কিছু দরকার নেই।

যন্ত্র যে মাঝে মাঝে কি অসহ্য যন্ত্রণায় পরিণত হয়, বিজিত সেটা বেশ বুঝল।

শুধু শব্দ, তাও উচ্চগ্রামে।

অথচ আশ্চর্য, সমবেত তরুণ-তরুণীরা এমন ভাব করছে, মনে হচ্ছে তারা খুব উপভোগ করছে।

এর চেয়ে নীচু সুরে সেতারের বাজনা বিজিতের কাছে শুধু শ্রুতিমধুরই নয়, প্রিয়ও।

মাঝে মাঝে বিজিতের বাবা সেতার নিয়ে বসেন।

হয়তো এক সময়ে শখ করে শিখেছিলেন। পরে রেওয়াজ করার আর অবকাশ পান নি।

স্কুল-জীবনে বিজিতের বাজনা শেখবার ইচ্ছা হয়েছিল।

সেতার কিংবা এসরাজ।

তারপর পড়ার চাপে আর সুযোগ হয় নি।

চেয়ারের শব্দ হতে বিজিত ফিরে দেখল।

রুণি পাশে এসে বসেছে।

'আমার কিন্তু ভারি ভয় ছিল, জানেন।'

'ভয়? কিসের?'

'ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো আসবেন না।'

বিজিত হাসবার চেষ্টা করল।

'সেকি, আসব না কেন?'

'শুনেছিলাম আপনি ভীষণ লাজুক, মুখচোরা।'

বিজিত কিছু বলল না।

মনে হল তরুণীরা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে উঠল।

দরজার প্রান্তে একটি যুবককে দেখা গেল।

ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুল, সুগৌর বর্ণ, সুঠাম দেহ।

কণি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

'হ্যালো জিমি।'

যুবকটি কণির দিকে ফিরে স্বল্প হেসে বলল।

'হ্যালো।'

কণি এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ধরে জিমিকে বিজিতের সামনে নিয়ে এল।

'জিমি প্যাটেল। টেনিস ষ্টার। টেনিসে ওয়েস্ট বেঙ্গলে টপ।'

জিমি বিজিতের দিকে একটা হাত প্রসারিত করে দিল।

বিজিত আড়ষ্টভাবে নিজের হাত এগিয়ে হেসে বলল, অবশ্য ইংরেজীতে, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব প্রীত হলাম।'

জিমি পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল।

'আপনার পরিচয়টা কিন্তু আমার জানা হ'ল না।'

বিজিত কিছু বলবার আগে, কণি বলল।

আমার বন্ধু বিজিত ব্যাণ্ডো।

নিজের পদবির এই অপরূপ রূপান্তর শুনে বিজিত অবাক হয়ে গেল।

জিমি পকেট থেকে একটা ভেলভেটের কৌটা বের করে বলল।

'এই নাও। জন্মদিন বার বার আসুক তোমার জীবনে।'

কণি জিমিকে নিয়ে বড় টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিজিত ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জিমি কৌটাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

একগাছা মুক্তার মালা।

সম্ভবত ইমিটেশন। আসলের দাম অনেক।

অবশ্য জিমির সামাজিক অবস্থার সঙ্গে বিজিতের কোন পরিচয় নেই। আসল মুক্তার হার উপহার দেবার সঙ্গতি তার আছে কি না, তাও জানে না।

কিন্তু হঠাৎ বিজিতের অদ্ভুত একটা কথা মনে হ'ল।

ইঙ্গ বঙ্গ এই সমাজটাই যেন মেকী। এখানে লোকে যা নয়, তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে। সাজসজ্জা, আলাপ-আলোচনা সবই নকল।

এরা ঠোঁট টিপে হাসে। মেপে কথা কয়। নিজেদের ঘিরে আভিজাত্যের একটা বলয় রচনা করে।

একটু পরেই বাজনা উদ্দাম হয়ে উঠল।

বিজিত দেখল জিমি আর কণি শরীর দুলিয়ে নাচতে আরম্ভ করল। এ নাচের নাম, পাড়ার ছেলেদের কল্যাণে বিজিতের জানা আছে। টুইস্ট।

শরীরকে নানা ভঙ্গীতে বেঁকিয়ে দুমড়ে এ নাচ চলে, তাই টুইস্ট।

শুধু কি শরীর, বিজিতের মনে হল, সমাজের রীতিনীতি, শালীনতাবোধ সব দুমড়ে বিকৃত করে বলেই, এর নাম টুইস্ট।

কণি আর জিমি ছাড়া আরও তিন চার জোড়া তরুণ-তরুণী নাচে মেতে উঠল।

বিরক্তিকর নাচ। বিজিত বিরক্ত হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরেই সে সভয়ে দেখল কণি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আসুন, আপনার সঙ্গে একটু নাচব।'

বিজিতের মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল প্রবাহ নেমে এল। সমস্ত শরীর অবশ।

খুব কষ্টে, প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল।

মাপ করবেন। আমি নাচতে জানি না।

কণি হেসে উঠল।

'কোন ভয় নেই আপনার। আমি স্টেপস্ ঠিক করে দেব। আপনি শুধু আমাকে ফলো করে যাবেন।'

বিজিত হাতযোড় করে রইল, কোন কথা বলল না।

কণি বুঝতে পারল বিজিত উঠবে না। তখন সে সরে গিয়ে আর একটি তরুণকে নাচের সঙ্গী করে নিল।

বিজিত বার বার নিজের দুর্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিল। শরীর খারাপের অজুহাতে না এলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। এ সমাজে সে বেমানান। এদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে কোনদিক দিয়ে তার মিল নেই। কোনদিন হবেও না।

ঘড়িতে আটটা বাজতেই সব থেমে গেল।

নাচ, বাজনা দুই-ই।

ভারি নেভিব্লু পর্দা সরিয়ে গোটাচারেক বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

কণি বক্তৃতার ভঙ্গীতে উচ্চকণ্ঠে বলল:

'লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, ডিনার ইজ রেডি।'

সবাই টেবিলে বসল। সব শেষে বিজিত।

কি ব্যাপার, আপনি সারাক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন।

চাপা কণ্ঠস্বরে বিজিত ফিরে দেখল।

আশ্চর্য, ভীড়ের মধ্যে মেয়েটিকে এতক্ষণ লক্ষ্যই করে নি।

হালকা ম্যাজেণ্টা রঙ শাড়ী, ম্যাচিং ব্লাউজ। কিন্তু ব্লাউজ আর শাড়ীর মাঝখানে কোন ফাঁক নেই। পানের মতন সুডোল মুখ, চোখদুটি ততটা টানা নয়, কিন্তু ভাষাময়। শ্যামাঙ্গী।

বিজিতও চাপা স্বরেই উত্তর দিল।

'আমি বিশেষ হৈ চৈ করতে পারি না।'

'আমিও তাই। কণির জন্মদিন, তাই বাধ্য হয়ে আসতে হ'ল।'

'আপনি কণির বান্ধবী?'

'কিছুটা। আমি তার মাসতুতো বোন।'

কণি টেবিলের এক প্রান্তে বসেছিল, কিন্তু আহারের ফাঁকে ফাঁকে সে উঠে সকলের তদারকও করছিল।

এক সময়ে ঠিক বিজিতের পিছনে দাঁড়িয়ে বলল।

আরে নীলার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়ে গেছে। আমারই উচিত ছিল আলাপ করিয়ে দেওয়া, কিন্তু নীলাকে খুঁজেই পেলাম না। নালা, তুমি কোথায় ছিলে?

নীলা কপট ক্রোধে গম্ভীর গলায় বলল, কণি, আমি নীলা নয়, নীলাদি। তুমি যে বয়সে আমার চেয়ে ছোট সেটা প্রায়ই ভুলে যাও।'

কণি হাসল, 'আহা, তার তো দেড় বছরের ছোট, তার জন্য তোমাকে দিদি বলতে হবে? তা, আমি কখনই পারব না।'

'ঠিক আছে, জন্মদিন বলে তোমার এ অপরাধ ক্ষমা করলাম।'

কণি বিজিতের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'জানেন, নীলা লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল। এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে।'

কণি কথা শেষ করতে পারল না। আর এক দিক থেকে তার ডাক এল।

'কণি, কণি, শুনে যাও, চোপরা কি মজার কথা বলছে।'

'আসছি।'

কণি দ্রুতপায়ে সেদিকে চলে গেল।

বিজিত নীলাকে বলল, 'আপনি নাচের সময় কোথায় ছিলেন? দেখতে পাই নি তো?'

'মাপ করবেন, ওই তাণ্ডবনৃত্য দেখবার শখ আমার নেই, ভালও লাগে না। আমি চেয়ার টেনে বারান্দায় বসেছিলাম। রাতের

কলকাতা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। আপনি নাচে যোগ দিয়েছিলেন নাকি?'

বিজিত একটা চপের কোণ ভেঙে মুখে দিয়েছিল। সেটা চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'সর্বনাশ, নাচ গান আমার আসে না। তাণ্ডব-নৃত্য বলছেন, তার তবু একটা তাল মান আছে। কিন্তু এতো সবটাই বেতালা, অর্থহীন লাফালাফি।'

সত্যি, এ যুগের ছেলেমেয়েগুলো কি হচ্ছে বলুন তো? এদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখে না। বরং আমাদের ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে যায়। আবার বিদেশের সংস্কৃতি বলে যে উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা বাঁধ কেটে নিজেদের ঘরে টেনে এনেছে, তার সঙ্গে বিদেশী সংস্কৃতির কোন সম্পর্কই নেই। এ নাচে শুধু দক্ষযজ্ঞ হয়।

বিজিত অবাক হয়ে শুনল।

নীলা তো ভারি চমৎকার কথা বলে। এ যুগের ছেলে হলেও এ যুগের সব কিছু বিজিতের ভাল লাগে না। গলির মোড়ে মোড়ে পাড়ার ছেলেদের গুলতানি, বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব এসব সে পছন্দ করে না।

এক সময় ডিনার শেষ হ'ল।

মুখ হাত ধুয়ে সবাই উঠে দাঁড়াল।

কণি বলল, 'সবাই ও ঘরে গিয়ে ব। এরপর কফি আছে।'

বিজিত আর দাঁড়াল না। নটা বেজে গেছে। বাড়ি যেতে রাত হয়ে যাবে।

কণির কাছে গিয়ে বিজিত বলল।

'আমি তাহলে চলি।'

'সে কি, কফি খাবেন না?'

'না, কফি খেলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না।'

কণি আর বাধা দিল না।

বিজিত বের হতে গিয়ে দেখল, দরজার কাছে নীলা অপেক্ষা করছে।

বিজিতকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে গাড়ী আছে ?'

লজ্জিত মুখে বিজিত মাথা নাড়ল, 'না, গাড়ী নেই। কেন, বলুন তো ?'

'আমার ভাল লাগছে না। তাছাড়া রাতও হয়েছে। বাড়ি ফেরা দরকার।'

'আপনি কোনদিকে থাকেন ?'

'আমি বালিগঞ্জ। একডালিয়া প্লেস।'

আশ্চর্য, এমন একটা কথা বলবে বিজিত স্বপ্নেও ভাবে নি। এ ধরনের কথা বলার ছেলে সে নয়, কিন্তু তার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল।

'আমি ট্যাক্সিতে ফিরব। আপনি যাবেন ?'

'আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো ?'

'না, না, অসুবিধা কিসের !'

'দাঁড়ান, কণিকে বলে আসি।'

নীলা কণিকে বলতে ভিতরে চলে গেল।

সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে বিজিত ভাবতে লাগল। নীলাকে এড়িয়ে গেলেই হ'ত। একডালিয়া প্লেসে নীলাকে নামিয়ে দিতে অবশ্য কিছু অসুবিধা হবে না। সে তো ওই পথেই যাবে।

বিজিত বেশী ভাববার অবকাশ পেল না।

'নীলার সঙ্গে কণিও এসে দাঁড়াল।'

কণির মুখ থমথমে, দু চোখে কৌতূহলের ছায়া।

'নীলাকে কি আপনি নিয়ে যাচ্ছেন ?'

বিব্রত কণ্ঠে বিজিত উত্তর দিল, 'না, মানে, উনি আমার সঙ্গে যেতে চাইছেন।'

কণি নীলার দিকে চোখ ফেরাল।

'কেন, একটু পরে গেলে তোমার কি মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে?'

নীলা হাসল, 'রামায়ণ মহাভারতের কথা নয়। খাওয়া-দাওয়া তো হয়ে গেল, আর থেকে কি করব।

'আমি তো বলেছি জিমি তোমাকে পৌঁছে দেবে। মা বাবা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

নীলা দু-এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর বলল, 'বেশ, তাই থাকি।'

বিজিত আর দাঁড়াল না। লিফটের জন্যও অপেক্ষা করল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

রাস্তায় নেমে একবার ওপরের দিকে দেখল।

না, বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

তাহলে আর ট্যাক্সি ডাকবার দরকার কি!

বিজিত দ্রুতপায়ে ট্রাম রাস্তার দিকে চলল।

বরাত ভাল। ট্রামের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ভীড়ও কম। বিজিত অবশ্য বসবার জায়গা পেল না। রড ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজিত শুনেছিল, কণির বাবা আর বিজিতের বাবা একই ধরনের কাজ করেন। কাছাকাছি মাইনে দুজনের। অথচ কণির বাবা এভাবে থাকেন কি করে!

কণির জন্মদিন যেভাবে পালিত হ'ল, বিজিত নিজের জন্মদিন উপলক্ষে তেমন কিছু করার কথ ভাবতেই পারবে না।

অবশ্য বিজিতদের নিজের বাড়ি। অনেক আগে বাবা জমি কিনে রেখেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি করেছেন। মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা করা কম কথা নয়।

ট্রাম থেকে নেমে বাড়ির দিকে যেতে যেতে কণির চেয়েও বিজিতের নীলার কথাই বেশী করে মনে পড়ল।

কণি যেন বড় উগ্র, অত্যন্ত অবারিত, কিছু পরিমাণে শালীনতা-বর্জিত। সেই তুলনায় নীলা অনেক শান্ত, অনেক সুষমামণ্ডিত।

বিজিত বাড়িতে ঢোকবার আগেই দেখল মা জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বোঝা গেল তারই অপেক্ষায়।

দরজা খুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে কেমন লাগল?'

বিজিতের যে ভাল লাগবে না, সেটা যেন মায়ের জানাই ছিল।

বিজিত মনের ভাব লুকাল না।

বলল, 'একটুও ভাল লাগল না, মা। আমি আর এসব জায়গায় যাব না।'

'কেন, ভাল না লাগবার কি হ'ল?'

বিজিত লক্ষ্য করে নি, তার বাবা এককোণে বসেছিলেন; খোলা খবরের কাগজের আড়ালে।

বিজিত একটু ইতস্তত করে বলল, 'বিলাতী অর্কেষ্ট্রা, নাচগান, বাঙ্গালীর বাড়িতে আমার যেন কেমন লাগল।'

কথাগুলো বলেই বিজিত আর দাঁড়াল না। ঘরের বাইরে চলে গেল।

বিজিত চলে যেতে বাবা মায়ের দিকে ফিরে হাসলেন, 'কমলবাবু একটু অ্যাংলিসাইজড্। মেয়েটাকেও ওইভাবে মানুষ করছেন।'

মা সরে এসে পাশের কৌচে বসলেন।

'মেয়ের তো বাঙ্গালী পরিবারেই বিয়ে দিতে হবে। মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু এমন উদ্ভট সাজগোজ করে।'

আর কোন কথা হ'ল না। দুজনেই চুপ করে গেলেন।

বিজিতের মা জানেন, তাঁর স্বামী অন্য লোকের জীবনযাত্রা, পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না।

বিজিত এ বাড়ির আবহাওয়ায় মানুষ। সেও নির্দিষ্ট একটা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। সাজপোশাকে, চালচলনে বিজিত অতি সাধারণ।

তার বাবা তাকে এইভাবেই মানুষ করতে চেয়েছিলেন।

মা যখন বিজিতের ঘরে এসে ঢুকলেন তখন সে শোবার আয়োজন করছে।

মাকে দেখে বিজিত হেসে বলল, 'ঠিক সময়ে এসেছ মা। এক গ্লাস জল দাও

মা জল এনে বিজিতের হাতে দিলেন।

'তোমাদের খাওয়া হয় নি?'

'হ্যাঁ, আজ আমরা নটার মধ্যেই খেয়ে নিয়েছি। তোর বাবা তাড়াতাড়ি ফিরেছিলেন।'

একটু চুপ করে থেকে মা জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁরে, কমলবাবু কিংবা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল?

বিজিত মাথা নাড়ল, 'না, তাঁরা ছিলেনই না।'

'কত লোক হয়েছিল?'

'তা জন কুড়ি-পঁচিশ হবে। হ্যাঁ মা—'

বিজিতের মনে অন্য প্রশ্ন উঁকি দিল। যে কথাটা সে রাস্তায় আসতে আসতে ভাবছিল।

'কমলবাবু এত খরচ করেন কি করে? যে এলাকায় থাকেন, সেখানে বাড়িভাড়া তো অনেক।'

শান্ত দৃষ্টি দিয়ে মা কিছুক্ষণ বিজিতকে জরিপ করলেন।

না, এটা শুধু প্রশ্ন, নিছক কৌতূহল।

এর পিছনে তুলনা করার কোন উদ্দেশ্য বিজিতের নেই।

খাটের একপাশে বসে মা বললেন, 'শুনেছি কমলবাবু খুব বড় ঘরের ছেলে। পৈত্রিক সম্পত্তি টাকা কড়ি অনেক পেয়েছেন। তাছাড়া লোকটি খরচ করতে ভালও বাসেন।'

কথা বলতে বলতেই মা লক্ষ্য করলেন, বিজিতের হাই উঠছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'নে, শুয়ে পড়। রাত হয়েছে।'

বের হবার সময় মা বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। দরজা বন্ধ করার দরকার নেই। দরজা খোলাই থাকে। পাশের ঘরেই বিজিতের

মা থাকেন। গ্রিল দেওয়া বারান্দা। দরজা খোলা থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

শরীরের চেয়েও মন বেশী ক্লান্ত।

বিজিত ভেবেছিল, বালিশে মাথা ঠেকালেই ঘুম আসবে। কিন্তু এল না।

পার্টির হৈ-চৈয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বিজিত যোগ দেয় নি, কিন্তু চিৎকার উদ্দামতা কেমন করে তার মস্তিষ্ককোষে পৌঁছেছে। উত্তপ্ত করে তুলেছে রক্তস্রোত।

বিজিতের অদ্ভুত এক উপমা মনে এল।

চারদিকে লবণাক্ত প্রক্ষিপ্ত জলরাশি। মাঝখানে তাল নারিকেল-এ শোভিত শান্ত এক দ্বীপ। সমুদ্রের তাণ্ডব দ্বীপের বুকে কোন আলোড়ন তুলতে সমর্থ হচ্ছে না।

নীলা সেই শান্ত দ্বীপের প্রতীক।

বিজিতের মতনই সে ওই পার্টিতে সম্পূর্ণই বেমানান।

পরের দিন রবিবার। ছুটি। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ার কোন তাগিদ নেই।

রাত জাগতে বিজিত খুব অভ্যস্ত। পরীক্ষার আগে ছাড়াও, রোজই প্রায় অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে।

কিন্তু আজ তার ঘুমানো খুব প্রয়োজন। অন্তত উত্তেজক চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

বাবার কথা মনে হ'ল।

বাবার কাছেই শোনা। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বিজিতের ঠাকুর্দা ছিলেন রেল-অফিসের সামান্য কেরানী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না, কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী আর সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞান। তার চেয়েও বড় কথা, জীবনের একটা আদর্শ ছিল।

বিজিতের বাবা এই আদর্শে মানুষ।

ঠাকুর্দা প্রতিদিন সকালে আর বিকালে নিজে ছেলেকে নিয়ে বসাতেন। পাঠ্যবিষয় ছাড়াও অনেক কিছু শেখাতেন। যে শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে আলোকবর্তিকার কাজ করেছিল।

ম্যাট্রিকে বিজিতের বাবা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই রসায়নে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে।

বেসরকারি কলেজ থেকে অধ্যাপনার ডাক এসেছিল। কিন্তু তিনি সে ডাকে সাড়া দেন নি। রিসার্চের দিকে ঝোঁক ছিল।

আর্থিক কারণে তাও সম্ভব হয় নি।

এক ফার্মে কেমিস্টের চাকরি নিলেন।

অদৃষ্ট, প্রথম যেদিন মাইনে পেলেন, তার দুদিন আগেই তাঁর বাবা মারা গিয়েছেন।

একথা বিজিতের বাবা প্রায়ই বলেন।

'প্রথম উপার্জনের টাকাটা বাবার হাতে তুলে দিতে পারি নি। ছেলের রোজগার তাঁকে নিতে হয় নি। পুণ্যাত্মা মানুষ। নিজের রোজগার ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করেন নি।'

তারপর ধাপে ধাপে বিজিতের বাবার উন্নতি হয়েছিল।

জমি কিনেছেন। বাড়ি করেছেন। একটি মাত্র সন্তানকে ডানা প্রসারিত করে ঝড়-ঝাপ্টা থেকে বাঁচিয়েছেন।

এ যুগে ছেলেদের মানুষ করে তোলা একটা দুরূহ সমস্যা।

সাংস্কৃতিক জগতে, রাজনৈতিক জগতে নূতন চিন্তার বন্যা এনেছে। এমন চিন্তা যার মূল এদেশের মাটিতে নয়। বয়সের ধর্মে সেই নকলকে আসল ভেবে সবাই মাতামাতি করছে।

বিজিতের বাবা ছেলেকে বুঝিয়েছেন। এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা, ভারতবর্ষের মর্মবাণীর স্বরূপ।

বিজিত এপাশ ওপাশ করল।

চোখ বন্ধ করলেই দুকানে অর্কেষ্ট্রার ঝঙ্কার। তরুণ-তরুণীর তালে তালে নাচের শব্দ।

বিজিত উঠে বসল।

জানলা দিয়ে ম্লান চাঁদের আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে।

এত রাত্রেও মোটরের শব্দ।

পার্টি থেকে কেউ ফিরছে হয় তো। বিরাটতর কোন পার্টি।

কণি যদি বাধা না দিত, তাহলে বেশ হ'ত।

নীলার সঙ্গে বিজিত এক ট্যাক্সিতে ফিরতে পারত।

নীলার জীবন, তার রুচি অরুচির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেত।

বাইরের লবির ঘড়িতে টং টং করে দুটো বাজল।

বেশ রাত হয়েছে। অথচ কিছুতেই বিজিতের ঘুম আসছে না।

খাট থেকে নেমে জল গড়াল। মুখে চোখে দিল, তারপর আবার বিছানায় ফিরে এল। পাশবালিশ আঁকড়ে প্রাণপণে দুটো চোখ বুজল।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা অনেক।

মুখের ওপর কড়া রোদ এসে পড়েছে।

বিজিত বাইরে এসে দেখল, প্রায় সাড়ে আটটা।

বাথরুম থেকে বের হতেই মায়ের সঙ্গে দেখা।

মা হেসে বললেন, 'বাবুর ঘুম ভাঙল ?'

'এত বেলা হয়ে গেছে, ডাক নি কেন মা ?'

'ছুটির দিন, তাই ডাকি নি। আয়, খাবার টেবিলে আয়।'

বিজিত মুখ হাত মুছে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল।

চা নয়, এক কাপ দুধ। সঙ্গে পাঁউরুটি।

বাবা নেই। বিজিত জানে, ছুটির দিন তিনি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যান।

দুধ খেয়ে বিজিত নিজের ঘরে ফিরে এল।

লাইব্রেরি থেকে উদ্ভিদবিদ্যার একটা বই এনেছে। সেটা শেষ করতে হবে।

মাটির অন্ধকার কোষ থেকে শিকড়ের সাহায্যে উদ্ভিদ প্রাণরস সংগ্রহ করে। সেই প্রাণরস রূপান্তরিত হয়ে কিশলয়ে লাবণ্য আনে, পুষ্পে সৌরভ।

মনোকটিলিডন ডাইকটিলিডন কত রকমের প্রকারভেদ।

পাখীর জগতে যেমন কোকিল। পরভৃত। নিজের শাবকের লালন-পালনের ভার দেয় অন্য জাতের পাখীর ওপর। অন্যের কুলায় ডিম রেখে আসে। উদ্ভিদজগতেও তেমনই আছে বিভিন্ন জাতের পরগাছা।

অন্য গাছকে শোষণ করে তার শ্রীবৃদ্ধি।

বিজিত পড়ে নোট করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তারকের মা খবরের কাগজ দিয়ে গেল।

বই সরিয়ে বিজিত কাগজ টেনে নিল।

প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে পাতা উল্টেই বিজিত চমকে উঠল!

পাতাজোড়া এক অভিনেত্রীর ছবি।

কিছু পরিমাণে বিস্রস্তবসনা, মুখ-চোখের চটুল ভঙ্গী।

হঠাৎ নমিতার কথা মনে পড়ে গেল। শমিতার দিদি নমিতা।

নমিতাও তো অভিনয় করে। বাঁচবার উপায় হিসাবে এই জীবিকাই সে বেছে নিয়েছে।

মনোযোগ দিয়ে বিজিত বিজ্ঞাপনটা পড়ল।

না নমিতা নয়। অলকানন্দা

নমিতার সঙ্গে যেন মুখের মিল আছে। সব অভিনেত্রীর মুখই যেন একরকম মনে হয়।

'কিরে, কি দেখছিস?'

বিজিত চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, পিছনে কখন মা এসে দাঁড়িয়েছেন।

দেখ মা, একে অনেকটা নমিতাদেবীর মতন দেখতে।

মা ভ্রূ কোঁচকালেন। কে নমিতাদেবী?

ওই যে শমিতার দিদি।

মা মুচকি হাসলেন। 'আমি কি নমিতাকে দেখেছি যে বলতে পারব? তুই তো দেখেছিস।'

'না মা। অনেকটা তার মত দেখতে কিন্তু এ অন্য মেয়ে এর নাম অলকানন্দা।'

আমি কিন্তু নমিতার খুব দোষ দেখি না। বাড়িওয়ালা অনেক কথাই বলল বটে।

বিজিত অবাক হয়ে মায়ের দিকে দেখল। কিছু বলল না।

মা-ই বললেন।

'মানুষ প্রথমে বাঁচতে চায়। এটা তার স্বাভাবিক ধর্ম। একজন ছুতোর যদি কাঠের কাজ করে, একটা দর্জি সেলাইয়ের কাজ করে তার পেট চালাবার চেষ্টা করে তাহলে যে মেয়ে অভিনয় করতে পারে কেনই বা সে ও লাইনে যাবে না? দরকার হলে আমরা কাউকে সাহায্য করব না, অথচ তার নিন্দায় পঞ্চমুখ হব, এটা কি ঠিক? আজ যদি নমিতা লোকের দরজায় সাহায্যের জন্য এসে দাঁড়াত, তাহলে কজন তাকে সাহায্য করত? আর সে স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করেছে বলে, তার নামে আমরা যা তা বলে বেড়াব?'

বিজিত বুঝতে পারল, সেদিনের বাড়িওয়ালার কথা শুনে মা গম্ভীর মুখে রিক্সায় এসে উঠেছিলেন। একটি কথাও বলেন নি। সব আক্রোশ চাপা ছিল।

আজ সুযোগ পেয়ে মা নিজের মত ব্যক্ত করলেন।

'নে, বেলা হয়ে গেছে। চান করে নে।'

মা যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

'বাবা কোথায়?'

'বাইরের ঘরে কে একজন এসেছেন। কথা বলছেন।'

বিজিত কাগজ সরিয়ে উঠে পড়ল।

আশ্চর্য যোগাযোগ।

নমিতার সম্বন্ধে কথা হবার দিন সাতেকের মধ্যে দেখা হয়ে গেল

কলেজে সরস্বতী পূজা। দু'দিন ধরে উৎসব।

ঠিক হ'ল, প্রথম দিন গানের জলসা। দ্বিতীয় দিন অভিনয়।

কথা হয়েছিল, অভিনয় কলেজের ছেলেমেয়েরাই করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পিছিয়ে গেল।

বই ঠিক করা, এক সঙ্গে জড় হয়ে রিহার্সাল দেওয়া হাঙ্গামার ব্যাপার। দায়িত্বেরও।

সে দায়িত্ব বহন করতে কেউ রাজী হ'ল না।

অধ্যাপকরা বললেন, 'তাহলে বাইরে থেকেই বরং কোন দলকে আমন্ত্রণ জানাও।'

নামকরা দলদের পাওয়া গেল না। তাঁরা অনেকেই অন্য জায়গায় বায়না নিয়েছেন, কিংবা আকাশ-ছোঁয়া দর হাঁকলেন।

শেষকালে 'নটদীপ' রাজী হ'ল। অ্যামেচার দল, তবে কিছু নাম আছে। এ কলেজের প্রাক্তন দু একটি ছাত্রও সে দলে আছে।

তাদের বিখ্যাত বই, 'এ জন্মের পর।'

অভিনয় দেখার ব্যাপারে বিজিতের কোনদিনই স্পৃহা নেই। তবে এ তাদের কলেজের ব্যাপার। সহপাঠীদের পাল্লায় পড়ে থাকতে হ'ল।

বিজিত ঠিক করে রেখেছিল, কয়েকটা দৃশ্য দেখেই বাড়ি পালাবে। এইজন্য সে প্রায় শেষদিকে বসেছিল। যাতে বেরিয়ে যেতে কোনরকম অসুবিধা না হয়।

কিন্তু প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যে তরুণী মঞ্চে প্রবেশ করল, তাকে দেখেই বিজিত টান হয়ে বসল।

সামান্য একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু তরুণী কথা বলতেই সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল '

বিজিত নীচু হয়ে হাতের প্রোগ্রামটা দেখল। না, কোথাও কোন দ্বিধা নেই।

স্পষ্ট লেখা আছে, মানসীর ভূমিকায় নমিতা সরকার।

মানসী নায়িকা নয় উপনায়িকা।

নায়ককে ভালবেসেছিল তাকে না পেয়ে প্রতিহিংসায় দুর্বার হয়ে উঠেছিল।

ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতন নিজের অঙ্গে ছোবলের পর ছোবল।

নিজের বিষে নিজে নীল হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় শেষের দিকে মানসী আত্মহত্যা করল। নায়কের বিয়ের রাত্রে।

এই দৃশ্যে নমিতা কিন্তু অপূর্ব অভিনয় করল।

সারা পৃথিবীর ওপর বিক্ষোভ, নিজের বঞ্চিত জীবনের জন্য বিধাতাকে অভিশাপ, তারপর তরল বিষ গলায় ঢেলে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া।

সমস্ত ব্যাপারটা অভিনয় জেনেও বিজিতের দুটি চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল।

অভিনয় শেষ হতে বিজিত বাইরে নয়, গ্রীণরুমের দিকে গেল।

সামনে একটি ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করল।

'একটু নমিতা সরকারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ভদ্রলোক বিজিতের আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'কি নাম বলব ?'

'নাম বললে হয়তো চিনতে পারবেন না। আমি এই কলেজেরই ছাত্র। ওঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

'আচ্ছা দাঁড়ান।' ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে বিজিত ভাবতে লাগল, নমিতাকে সে কি বলবে? কি কথা তার বলবার আছে।

এতদিন পরে তাকে নমিতা কি চিনতে পারবে?

'আপনি যান ভিতরে।' ভদ্রলোকটি বিজিতের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বিজিত শঙ্কাকুল হৃদয়ে ঢুকে পড়ল।

উইংস-এর পাশে কয়েকটি মেয়ে পুরুষ জটলা করছে।

বয়েকজন ছোট চামড়ার সুটকেশ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একজন বিজিতকে জিজ্ঞাসা করল।

'কাকে চাই?'

'নমিতা সরকার।'

লোকটি কোণের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

একটু এগিয়েই বিজিত দেখতে পেল।

ছোট টেবিলের ওপর গোল একটা আয়না।

তার সামনে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে নমিতা নিবিষ্টচিত্তে একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুখের রং তুলতে ব্যস্ত।

যে শাড়ী পরে আত্মহত্যা করেছিল পবণে সেটাই।

দু পায়ে আলতার গাঢ় প্রলেপ।

বিজিতের পায়ের শব্দ হতেই নমিতা বলল।

'কি বলবেন বলুন। আচ্ছা নারকেল তেল দিয়েছে, রঙই উঠছে না!'

বিজিত আশা করেছিল নমিতা ফিরে দেখবে। তাহলেই সম্ভবত তাকে চিনতে পারবে।

কিন্তু নমিতা দেখল না।

একটু জোর গলায় বিজিত বলল, 'আমি বিজিত।'

বলেই মনে পড়ল, তার নামের সঙ্গে নমিতার হয়তো পরিচয় নেই। তার নাম সে কোনদিন শোনে নি।

নাম শুনে নয়, কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় নমিতা মুখ ফেরাল।

নমিতার মুখটা অদ্ভুত ঠেকল।

কয়েক জায়গায় রং উঠেছে, আবার কয়েক জায়গায় রংয়ের আস্তরণ অবিকৃত। নমিতা যেন তখনও নাটকের উপনায়িকা আর স্বাভাবিক জীবনের মাঝামাঝি স্তরে।

'এদিকে আসুন তো, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বিজিত যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে কিছুটা অন্ধকার।

আলোগুলো উইংস-এর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

যে আলোটা নমিতার সামনে ঝুলছে, বিজিত তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

পরিপূর্ণ আলোতেও নমিতা বিজিতকে চিনতে পারল না।

'কি দরকার বলুন তো?'

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

নমিতা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'মাসের মধ্যে দশটা থিয়েটার করি। কত জায়গায় যাই কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, সবাইকে কি মনে রাখা সম্ভব?'

বিজিত মৃদুকণ্ঠে বলল।

একবার আপনার বোন শমিতা বৃষ্টির সময় আমাদের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের শাড়ী ব্লাউজ ভিজে যাওয়ায় আমার মায়ের জামা-কাপড় পরতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই শাড়ী জামা আমি আপনাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম।

নমিতা কিছু বলল না। একদৃষ্টে বিজিতের দিকে চেয়ে রইল।

ভাবটা যেন, সবই বুঝলাম, কিন্তু তার জের টেনে আজ এখানে এসে দাঁড়াবার হেতুটা কি?

নানা ছলে অনেকেই মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাতে আসে। নমিতার মতন মেয়েদের সঙ্গে। এদের সবাই সহজলভ্য মনে করে।

কিন্তু সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির সে বয়স এখনও হয় নি। যদিও অকালপক্ক ছেলের ইদানীং অভাব নেই।

বিজিতেরও নিজেকে কিঞ্চিৎ বোকা মনে হ'ল।

নমিতার সঙ্গে এভাবে দেখা করার কি প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এতটা এগিয়ে আর পিছানোও সম্ভব নয়।

তাই সে বলল, 'আর একবার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আপনারা তখন সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন।'

বিজিত কোন কাজের কথা বলতে আসে নি জেনে, নমিতা আবার নিজের মুখের রং তোলায় মনোনিবেশ করেছিল।

মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আমরা এখন বালিতে থাকি। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের ওপর।'

'শমিতা দেবীও ওখানে আছেন?'

হঠাৎ কথাটা বিজিতের মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল।

নমিতা এবার তার চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে বিজিতের মুখোমুখি হ'ল।

'কি ব্যাপার বলুন তো? শমিতার সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ? শুধু আলাপ না আরো গভীর কিছু?'

বিজিত কিছু বলবার আগেই পিছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল।

'কি নমিতা, কত দেরী করছ? নাও নাও, সবাই যে চলে গেল।'

নমিতা কাপড় দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, 'আর বল না অসীমদা, শমির প্রেমিকের পাল্লায় পড়ে প্রাণ যাচ্ছে।'

বিজিত পিছন দিকে ফিরতেই লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল।

অসীম কর। আজকের নাটকের নায়ক।

অসীম এগিয়ে এসে একেবারে বিজিতের কাঁধে একটা হাত রাখলেন।

'আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে ভাই। অন্য সময় দেখা করবেন। শমিকে বলব আপনার কথা।'

মাথা নিচু করে বিজিত সরে এল।

এভাবে নমিতার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য নিজের ওপর রাগ হ'ল। ছি, ছি, কি বিশ্রী একটা কথা তিনি বললেন।

শমিতার সঙ্গে বিজিতের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তিনি কল্পনা করে নিলেন কি করে!

সামনের গেটে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে বিজিত পাশের গেট দিয়ে বের হ'ল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, পথে ঘাটে নমিতা শমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও সে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। না চেনার ভাণ করবে।

নমিতাকে তার কোনদিনই ভাল লাগে নি। সে তুদিন শমিতাদের বাড়ি গিয়েছিল, তুদিনই দেখা হয়েছিল নমিতার সঙ্গে।

শেষদিন তার সঙ্গে নমিতা যেভাবে কথা বলেছিল, তা তো রীতিমত অপমানজনক। দিন তুয়েক বিজিত একেবারে চুপচাপ রইল।

মা বরং জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কিরে কলেজের ফাংশন কেমন হ'ল?'

উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বিজিত বলেছে, 'ওই এক রকম।'

অথচ মাকে নমিতার কথাটা বলবার জন্য বিজিত মনে মনে খুবই উদগ্রীব হয়ে পড়ছিল।

একদিন আর থাকতে পারল না।

সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে। অকালবর্ষণ। এর পর হয়তো শীত আসবে।

শীত বিজিতের খুব প্রিয় ঋতু। গরম চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে তুলে তুলে বই পড়তে কি আরাম!

বাইরের ঘরে বসে বিজিত নিজেদের কলেজের পত্রিকা পড়ছিল। এই পত্রিকায় তার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্যারাসাইটদের বৈশিষ্ট্য। ইংরেজীতে লেখা। রচনাটি অধ্যাপক মহলে তারিফ

কুড়িয়েছে। লেখকের বয়স ও অভিজ্ঞতার অনুপাতে লেখাটি ভালই।

মা কাছেই বসেছিলেন। তিনিই কথাটা শুরু করলেন। 'এভাবে হঠাৎ বৃষ্টি হ'লেই আমার শমিতার কথা মনে পড়ে যায়। মেয়েটা ভিজতে ভিজতে কিভাবে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।'

পত্রিকা থেকে মুখ না তুলে বিজিত বলে ফেলল—

'শমিতার দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল মা।'

'শমিতার দিদির সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ, নমিতা সরকারের সঙ্গে।'

'কবে রে ? কোথায় ? শমিতার কথা কিছু বলল ?'

বিজিত সাবধান হয়ে গেল। সব কথা মাকে বলা সম্ভব নয়। উচিতও হবে না।

অভিনয় শেষে বিজিত নমিতার সঙ্গে গ্রাণরুমে গিয়ে দেখা করেছিল, এটা হয়তো মা পছন্দও করবেন না।

'সরস্বতীপূজার সময় আমাদের কলেজে যে থিয়েটার হ'ল, "এ জন্মের পর", তাতে নমিতা অভিনয় করেছিল।

'চিনতে পারল তোকে ?'

মায়ের প্রশ্নে বিজিত চমকে উঠল, তারপর সামলে নিয়ে বলল—

'আমার সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায় যে চিনতে পারবে। মানসী সেজেছিল। প্রোগ্রামে নাম দেখলাম।'

'অ। কই কিছু বলিসনি তো এতদিন।'

'এ আর কি বলব। তবে একটা খবর পেয়েছি।'

'কি ?'

'পাশের দর্শকরা বলাবলি করছিল নমিতা নাকি বালিতে থাকে।'

একটু পরে মা বললেন, অনেকটা যেন নিজের মনেই—'একটা লোক সরে গেলে গোটা সংসারের কি ছন্নছাড়া চেহারাই যে হয়।'

বিজিত প্রতিবাদ করল—

'তা কেন মা। শমিতার বাবা বেঁচে থাকতেই তো নমিতা দেবী অভিনয় করতেন। আমি তো জানি। আমার সামনেই কথা হয়েছে।'

মা আর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

শমিতার প্রতি মায়ের কেমন যেন দুর্বলতা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার দেখা। অমন এক দুর্যোগে অন্য যে কোন মেয়ে ও অবস্থায় পড়লে তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিতে হ'ত। ভিজে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো জামাকাপড় দেওয়াও কর্তব্য।

কিন্তু এ সবের জন্য নয়।

শমিতা যে নিজের মাতৃহীন অসহায়তার কথা উল্লেখ করেছে, তাতেই মায়ের হৃদয় গলেছে। আহা, মেয়েটির মা নেই। মা না থাকা মানে কেউ না থাকা। বাপ আর কতটুকু দেখতে পারে।

মাতৃহীনদের সম্বন্ধে এমন কথা মায়ের মুখে বিজিত অনেকবার শুনেছে।

কলেজ থেকেই বিজিতরা বাইরে গেল।

মধ্যপ্রদেশের ছোট এক শহরে।

অবশ্য শহরে তারা থাকবে না। শহরকে কেন্দ্র করে আশপাশে বনভূমিতে ঘুরে বেড়াবে।

বটানি অনার্সক্লাসের সবশুদ্ধ বাইশ জন। তার মধ্যে দুটি মেয়ে।

এর আগে। বিজিত এত দূরে কখনও যায় নি।

মনে আছে বৈদ্যুতিক ট্রেন হবার পর বাবার সঙ্গে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়েছিল।

তাই এবারে তার অসীম উৎসাহ।

বিজিতের যেমন উৎসাহ, তার মায়ের তেমনই চিন্তা।

বার বার উপদেশ দিচ্ছেন—'খুব সাবধান, যেখানে সেখানে জল খাবে না। কখনও দলছাড়া হবে না। টাকাপয়সা ঠিক করে

রাখবে, শরীর একটু খারাপ হলেই, আমাদের টেলিগ্রাম করে দেবে।'

বাবা কিন্তু এ ধরনের কথা বলছেন না।

তিনি বলছেন—গাছগাছড়ার স্পেসিমেন যা সংগ্রহ করবে, খুব সাবধানে রাখবে। হাতে গ্লাভস্ পরে কাজ করবে। অনেক বিষাক্ত গাছপালা আছে। যাদের দেখে বোঝা যায় না।

দুজনের কথাই বিজিত মন দিয়ে শুনল।

তারপর একদিন রওনা হয়ে গেল।

বিলাসপুরে নেমে সবাই গরুর গাড়ী চাপল।

সেখান থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল।

থাকার বন্দোবস্ত তাঁবুতে।

সে বন্দোবস্ত আগেই করা হয়েছে।

সঙ্গে চারজন অধ্যাপক। তিনজন বটানির, আর একজন এসেছেন ম্যানেজার হিসাবে। তিনি বাংলা পড়ান। কবি হিসাবেও খ্যাতি আছে।

যখন সবাই বনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছাল, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই গাছপালার রাজ্যে অন্ধকার যেন খুব তাড়াতাড়ি নামে। চারদিকে ঝিঁঝিঁর শব্দ। জোনাকির দীপ্তি। বিচিত্র সব আওয়াজও শোনা গেল।

বিজিত রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

গাছের ডালে কয়েকটা হ্যাজাক জ্বালানো। মাটিতে গর্ত করে উনানের ব্যবস্থা। রান্না শুরু হয়েছে।

অধ্যাপকরা ছাত্রদের নাম ডেকে তাঁবুতে স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন।

মাঝখানের তাঁবু খুব ছোট আকারের। সেখানে মেয়ে দুটি থাকবে।

অন্য তিনটি তাঁবুতে ছেলের দলের সঙ্গে অধ্যাপকরা।

রান্নাবান্নার লোকরা তাঁবুর মধ্যে থাকতে চাইল না।

তারা বলল, 'না বাবু, দম বন্ধ হয়ে মরব ওর মধ্যে। আমরা চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে বাইরে শোব।'

তাই হ'ল।

সারা রাত বিজিতের ঘুম হ'ল না। তার মনে হ'ল নরখাদক পশুর দল তাদের তাঁবুর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক একবার এও মনে হ'ল, এখানে না এলেই ভাল হ'ত। অসুস্থতার ছুতোয় বাড়িতে থাকলেই হত।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু অরণ্যের রূপ বদলে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই বিজিত শুনতে পেল, ডালে ডালে পাখির কাকলী। মৃদু মন্দ বাতাসের শব্দ।

বাইরে এসে দেখল নানা রঙের পাখির জটলা। ঝাঁক ঝাঁক বহুবিচিত্র পাখনা প্রজাপতি উড়ছে। অনেক দূরে আদিবাসীদের গান।

চা রুটি খেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে।

বিজিত আর অরিন্দম এক সঙ্গে। দুজনেই নামী ছাত্র।

দুজনের সামনে যেন নতুন জগত। এত রকমের গাছপালা এদেশে আছে, জানাই ছিল না। নানা শ্রেণীর ফার্ণ, বহুজাতের পরগাছা। কোন কোন পরগাছা ফুলে বোঝাই। সাদা আর বেগুনি রংয়ের ফুল। সুবাসে সারা বনভূমি উতল।

দুজনে অরণ্যের অনেকটা ভিতরে চলে গিয়েছিল।

বিরাট সাইজের সব গাছ। মেহগনি, অর্জুন, শিরীষ, শিশু। শাখাপ্রশাখা মেলে সূর্যের আলো আটকে দিয়েছে। মাটিতে আর্দ্রতা। সোঁদা সোঁদা গন্ধ। আবছা অন্ধকার।

একটা পাথরের চাতালে বসে বিজিত সংগৃহীত গাছপালার হিসাব করছিল। সেই সঙ্গে শ্রেণীবিভাগ।

অরিন্দম জলের খোঁজে গেছে। পাহাড়ী ঝর্ণার কলধ্বনি ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ঝর্ণা খুব দূরে নয়।

হঠাৎ দুপদাপ শব্দ। মনে হ'ল বন কাঁপিয়ে বিরাট কোন বন্য জন্তু ছুটে আসছে।

বিজিত দাঁড়িয়ে উঠল।

সামনে একটা ঝোপ। পাতা এত ঘনসন্নিবদ্ধ যে ওদিকের কিছু দেখার উপায় নেই।

দু'এক মুহূর্ত তারপরই একটা চীৎকার।

প্রবল ধাক্কায় বিজিত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সম্বিত যখন ফিরে পেল, দেখল তাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে তার বুকের ওপর থরথর করে কাঁপছে কেয়া! কেয়া সেন।

অধ্যাপক রায় এগিয়ে এসে তাকে তুলে ধরলেন।

অরিন্দম ঝর্ণা থেকে জল এনেছিল। সেই জলের ঝাপটা কেয়ার মুখে চোখে দিতে সে চোখ খুলল।

তারপর বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করতে ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

বিজিতের হাত পায়ের কয়েকটা জায়গা ছড়ে গেছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

দেহের ক্ষত তার এমন কিছু নয়, কিন্তু মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

কেয়া ছুটে তার বুকে এসে পড়াতে টাল সামলাবার জন্য সেও কেয়াকে জড়িয়ে ধরেছিল।

এমন একটা অভিজ্ঞতা বিজিতের জীবনে এই প্রথম।

নিছক ভয় নয়, সুখের আবেশও না, দুটো মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি!

বিজিতের মনে হল কৈশোরের খোলস ছাড়িয়ে সে যেন আর এক পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে।

তার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নতুন এক সত্তা।

অধ্যাপক রায় যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বিজিত লাগে নি তো?' তখনই বিজিত কোন উত্তর দিতে পারল না।

বুকের ওপর কেয়া আর নেই, তবু বিজিতের মনে হ'ল ফুলের মতন কেয়ার নরম স্পর্শ বিজিতের রক্তকোষে ছড়িয়ে আছে।

আরণ্য পরিবেশে বিজিত নিজের পৌরুষকে খুঁজে পেল।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা পরে জানা গেল।

ঝোপের এপাশে যেমন বিজিত, তেমনই ওপাশে অনীতা আর কেয়া আঁচলে জড়ো করা লতাপাতার নমুনাগুলো বাছাই করছিল।

হঠাৎ আওয়াজ শুনে চোখ তুলে দেখল, কালো মেঘের মতন রং, ছোট খাট পর্বতের মতন দেহ একটি হাতি জঙ্গল ভেঙে আসছে।

অনীতা চীৎকার করে দৌড়াতে আরম্ভ করল। কেয়া এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য পরে দেখেছিল। দেখা মাত্রই এদিক দিয়ে ছুটে যেতে গিয়ে পাথরে হোঁচট লেগে বিজিতের বুকের ওপর পড়ে গিয়েছিল।

অধ্যাপক রায় কাছেই একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। চীৎকার শুনে ছুটে এসেছিলেন।

সবাই তাঁবুতে ফিরে গেল।

খোঁজ নেওয়া হ'ল। বুনো হাতি নয়। অরণ্যের ধারে রাজার বাড়ি আছে। সেখানে গোটা চারেক হাতি থাকে।

রাজার বাড়িটুকুই আছে, রাজার সম্পদ আর মর্যাদা কোনটাই নেই। রাজা এখন তেজারতি কারবার করছেন।

হাতিগুলো এখন প্রায় বেওয়ারিশ। বনে বনে ঘুরে বেড়ায়।

হাতি বুনো হোক, আর গৃহপালিত হোক, অধ্যাপকরা সাবধান হয়ে গেলেন।

অরণ্য বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এক বন্দুকধারী প্রহরী ঠিক করা হ'ল। সেই প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে রইল।

বাইরের বিপদের সম্ভাবনা হয়তো কমল, কিন্তু বিজিতের মনের প্রহরী তাকে বাঁচাতে পারল না।

নরম পাতার স্পর্শে বিজিত উন্মনা হয়ে যেতে লাগল। আর এক কোমল স্পর্শের কথা বুঝি মনে পড়ে গেল।

সামান্য একটু স্পর্শ, কিন্তু সেই স্পর্শেই রংমহলের দ্বার খুলে গেল। এক নতুন জগত উন্মোচিত হ'ল বিজিতের চোখের সামনে।

ফেরার আগের দিন একটা প্রীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ল। কেউ গান গাইল, কেউ গীটার বাজাল, আবার কেউ আবৃত্তি।

বিজিত একটা আবৃত্তি শুরু করেছিল, হঠাৎ কেয়ার দিকে চোখ পড়তেই সে থেমে গেল।

কেয়াও তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।

সেদিনের পর থেকে বিজিত কেয়াকে এড়িয়ে গেছে।

সামনাসামনি পড়লেও পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

কিছুতেই সহজ হতে পারে নি।

কেয়া বিজিতের চেয়েও সিনিয়র। কলেজেও যেমন, বয়সেও তেমনই।

কেয়ার প্রতি বিজিতের দুর্বলতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কেয়া শুধু মাধ্যম। বিজিতের অনাস্বাদিত এক অনুভূতির মাধ্যম।

ট্রেনটা হাওড়া পৌঁছল বেলা দশটায়।

এখানেই অধ্যাপকদের দায়িত্ব শেষ।

স্টেশন থেকে ছাত্রছাত্রীরা যে যার বাড়িতে ফিরে যাবে।

কুলির মাথায় সুটকেশ আর ঝোলা দিয়ে বিজিত এগিয়ে চলল।

তার নিজের হাতে কাপড়ের ব্যাগ। তার মধ্যে কষ্টার্জিত গাছগাছড়ার নমুনা।

একটু গিয়েই বিজিত থমকে দাঁড়াল।

প্ল্যাটফর্মের একধারে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় কোন লোকাল ট্রেনের অপেক্ষায়।

দূর থেকে একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু কাছে গিয়েই নিঃসন্দেহ হ'ল।

শমিতা দেবী।

শমিতা একমনে কি দেখছিল, তার নাম শুনে চমকে মুখ ফেরাল।

মুখ ফেরাল কিন্তু বিজিতকে ঠিক চিনে উঠতে পারল না।

ট্রেন যাত্রার জন্য বিজিতকে খুব পরিশ্রান্ত, মলিন দেখাচ্ছে।

'কে ?'

'আমি বিজিত'।

'বিজিত।'

শমিতা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল। চিনতে পেরেছে এমন কোন ছাপ তার মুখের রেখায় দেখা গেল না।

মনে নেই আপনার, এক বৃষ্টির দিন আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মায়ের শাড়ী ব্লাউজ—'

আর বলতে হ'ল না।

শমিতা হাসল। বলল—'মনে পড়েছে। আপনার মা ভাল আছেন ? তাঁর কথা আমি কোনদিন ভুলব না।'

'ভালই আছে। মা একদিন আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলেন।'

'আমাদের বাড়ি ? আপনার মা ?' কথাটা শমিতার যেন অবিশ্বাস্য মনে হ'ল।

'হ্যাঁ, আমিও সঙ্গে ছিলাম। আপনারা তখন সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আপনাদের বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হল।'

'বাড়িওয়ালা ? কি বলল, আমাদের নামে, গালমন্দ করল না ?'

বিজিত সোজাসুজি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপনারা কোথায় উঠে গেছেন, সে খবর দিতে পারলেন না।'

শমিতা খুব ক্লান্ত কণ্ঠে বলল—'অনেক টাকা বাড়িভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের হাতে-পায়ে ধরেছিলাম, কিন্তু কোন কথাতেই কান দিলেন না। কাজেই মায়ের সামান্য যে ক'খানা

অলঙ্কার বাবার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো বেচে উদ্ধার পেলাম। তা না হলে ভদ্রলোক ছাড়তেন না, মামলা ঠুকে দিতেন।'

একবার বিজিতের ইচ্ছা হ'ল বলে, কেন আপনার দিদি তো অভিনয় করে উপার্জন করেন। তিনি দেনা শোধ কর ে পারলেন না।'

এমন প্রশ্ন না করে, বিজিত শুধু বলল—'আপনার দিদির সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল।'

—'দিদির সঙ্গে?'

বিজিত স্পষ্ট দেখতে পেল শমিতার দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল। ঠোঁটের প্রান্ত বেঁকে গেল। সে বিজিতের একটু কাছে সরে এসে জিজ্ঞাসা করল। 'দিদির সঙ্গে? কোথায়?'

'—আমাদের কলেজে, মানে প্রেসিডেন্সি কলেজে, "নটদীপ" অভিনয় করতে এসেছিল। আপনার দিদিও ছিলেন সে দলে। অভিনয়ের শেষে আপনার দিদির সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

—'আপনি!'

কথাটা শমিতার যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ল না।

দুদিনেই বিজিতের যেটুকু পরিচয় পেয়েছে তাতে তাকে লাজুক, মুখচোরা বলেই মনে হয়েছে।

দিদির সঙ্গে গিয়ে দেখা কর ত পারে, এমন ধরনের ছেলে তো নয়।

তবে বলাও যায় না। মাঝখানে অনেকটা সময় গিয়েছে। বিজিত হয়তো অভিজ্ঞ হয়েছে, কিছুমাত্রায় প্রগল্‌ভও।

এই তো শমিতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

অথচ, সেদিন শমিতার পাশাপাশি অতটা পথ চলবার সময় একটি কথাও বলে নি। শমিতার দিকে ফিরেও দেখে নি।

অন্য ছেলে হলে এমন সুযোগ ছাড়ত!

—'দিদি চিনতে পারল আপনাকে ?'

বিজিত মাথা নাড়ল।

'না। আমি পরিচয় দেবার পরও চিনতে পারলেন না। কেবল বললেন, এখন আপনারা বালিতে আছেন।

স্টেশন কাঁপিয়ে বৈদ্যুতিক ট্রেন এল।

ট্রেন থামতেই প্ল্যাটফর্ম লোকে পূর্ণ হয়ে গেল।

ভীড়ের মধ্যে পথ করে এগিয়ে যেতে যেতে শমিতা একবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে বিজিতকে দেখে বলল—

'আপনার মাকে বলবেন, একদিন দেখা করব।'

তারপর শমিতা ভীড়ে হারিয়ে গেল।

তবু বেশ কিছুক্ষণ বিজিত দাঁড়িয়ে রইল। যদি শমিতাকে দেখা যায়।

একবার ভাবল, ট্রেনের কাছে গিয়ে কামরায়, কামরায় উঁকি দিয়ে শমিতাকে খুঁজবে।

কিন্তু পরেই ভাবল, কি হবে খুঁজে। আর তো কোন কথা বলার নেই।

কৌতূহল শুধু বিজিতেরই।

শমিতা তো একবারও জিজ্ঞাসা করল না, বিজিত কোথা থেকে আসছে। তার এ রকম ধূলি-মলিন চেহারা কেন।

বিজিত বাইরে এল।

আজ যে বিজিত ফিরবে এ কথা তার বাড়ির কেউ জানে না। যেদিন ফেরার কথা তার একদিন আগেই সে ফিরেছে।

ট্যাক্সি করে বিজিত যখন বাড়ির সামনে নামল, তখন বেলা প্রায় বারোটা।

মালপত্র রাস্তায় নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া দিয়ে বিজিত কলিং বেল টিপল।

কলিং বেলটা বিজিতের উৎসাহেই হয়েছে।

আগে সবাই কড়া নাড়ত।

জানলা দিয়ে ছোকরা চাকর রঘু উঁকি দিল :

—'এই মালপত্রগুলো তোল।'

রঘু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

—'মা আজ আপনার কথা বলছিলেন দাদাবাবু।'

—'মা কোথায় ?'

—'স্নান করছেন।'

রঘু মালগুলো তুলে আনল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে বিজিত বাথরুমে জলের শব্দ পেল।

বাবা বেরিয়ে যান নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে। মোটর আসে পৌনে নটায়। বিজিতও দশটার মধ্যে কলেজে রওনা হয়।

তারপর কোন কাজ নেই, কিন্তু মায়ের আর খাবার সময় হয় না।

এক ঘণ্টার ওপর পূজার ঘরে কাটান। তারপর এ ঘর ও ঘর ঘুরে সব তদারক করা। বিজিতের টেবিল গোছানো। তারকের মায়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা।

ফলে খেতে বসতে একটা বেজে যায়।

বিজিত অনেক বলেছে। কোন কাজ হয় নি।

বিজিত বাথরুমের দরজায় গিয়ে চেঁচাল।

মা ভিতর থেকে উত্তর দিলেন :—

'দাঁড়া রে যাচ্ছি। মুখে সাবান দিয়েছি।'

বিজিত নিজের ঘরে ঢুকল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মা এসে হাজির।

কোনরকমে শাড়ীটা জড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে চলে এসেছেন।

বিজিতের পরনে গেঞ্জি আর পাজামা।

বিজিতকে দেখে মা নিজের গালে আঙুল ঠেকালেন।

—'কদিনে কি চেহারা হয়েছে রে তোর ?'

বিজিত হাসল।

—'দাড়ির কথা বলছ তো। কি করব চলন্ত ট্রেনে দাড়ি কামাতে আমার সাহস হয় না মা। যদি কেটে যায়। অন্য সবাই কেমন কামাল।'

—'না, না, দাড়ির কথা বলছি না। রং কালো হয়ে গেছে, রোগা হয়ে গেছিস। ওখানে খাওয়া-দাওয়া ভাল হ'ত না বুঝি।'

বিজিত বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, আমার ভাত হবে তো মা। আমি চান করে আসছি। বড় খিদে পেয়েছে।

দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে বিজিত খেতে এল।

মা পাশে নয়, উল্টো দিকে বসলেন। যাতে বিজিতকে ভাল করে দেখতে পান।

'তোর কাল আসবার কথা ছিল না ?'

'হ্যাঁ মা, একদিন আগেই চলে এলাম। যা হাতির দৌরাত্ম্য।'

মা ভাতের গ্রাস মুখে তুলছিলেন, গ্রাস নামিয়ে রেখে আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন,—

'হাতি ? সর্বনাশ। অমন জায়গায় ছাত্রদের কখনও নিয়ে যেতে আছে। তোদের প্রফেসররা আগে খোঁজ-খবর নেন নি।'

'ঠিক বুনো হাতি নয় মা। পোষা হাতি। হঠাৎ খেপে গিয়েছিল।'

বিজিত সবিস্তারে সেদিনের বিবরণ দিল।

সবটুকু নয়। সব বলা সম্ভবও ছিল না। বিবরণ দিতে দিতেই বিজিত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

স্পর্শের সেই উন্মাদনা নতুন করে অনুভব করল।

মা বললেন, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন। আর তোমার কোথাও গিয়ে দরকার নেই বাপু।'

খাওয়া শেষ করে বিজিত উঠে পড়ল।

এতক্ষণ পরে বেশ ক্লান্তি বোধ করল। ঘুম পাচ্ছে। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অবসাদ।

বিছানায় গা ছোঁয়াতেই তার দু চোখে গাঢ় ঘুম নেমে এল।

ঘুম থেকে উঠে মনে হল, মাকে শমিতার কথা বলা হয় নি।

মুখ চোখ ধুয়ে নীচে নেমে দেখল মা রান্নাঘরে। তারকের মায়ের সাহায্যে ব্যস্ত।

পায়ের শব্দ পেয়েই মা ডাকলেন, 'ওরে চা খেয়ে যা।'

এই একবেলা শুধু তার চায়ের বরাদ্দ। সকালে মায়ের হুকুমে দুধ খেতে হয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিজিত বলল, 'তখন তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মা।'

'কিরে?'

'শমিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

মা অবাককণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'শমিতার সঙ্গে? সেই জঙ্গলে?'

বিজিত হাসল।

'না মা, জঙ্গলে নয়। ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে।'

'কিছু বলল?'

'হ্যাঁ, বলল তোমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে আসবে।'

—'আমার সঙ্গে।'

মায়ের কণ্ঠ বেশ উৎফুল্ল মনে হ'ল।

'হ্যাঁ মা, তাই তো বলল।'

'শমিতাকে কেমন দেখলি?

কেমন দেখেছে বিজিত চিন্তা করল। মাত্র তিনদিন তাকে দেখেছে। তবে এবার অনেক দিন পরে। বিজিতের মনে হ'ল, শমিতার চোখের কোণে কালি, চেহারাও যেন একটু শীর্ণ।

তবে এসব কথা মাকে বলে লাভ নেই।

এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে শমিতাকে দেখেছে একথা মা শুনলে কি মনে করবেন।

'স্টেশনে কি করছে?'

'একটা লোকাল ট্রেনে উঠে পড়ল।'

—'কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি?'

—'না মা, তার সময়ও ছিল না। আমি তখন খুব ক্লান্ত।'

—'তা সত্যি।'

মা আর কিছু বললেন না।

চা খাওয়া শেষ করে বিজিত নিজের ঘরে চলে এল।

সে ভেবেছিল, বিকালে একটু বেড়িয়ে আসবে। অন্তত কাছের পার্কে।

কিন্তু দুটি কারণে বের হ'ল না।

প্রথম, হাতে অনেক কাজ রয়েছে। গাছপাতার নমুনাগুলো খাতায় আটকে তাদের সম্বন্ধে নোটস লিখতে হবে। ক্লাশে অধ্যাপক দেখবেন।

দ্বিতীয়, যেটা মুখ্য কারণ, সেটা হ'ল বাবার সঙ্গে দেখা করা। অফিস থেকে ফিরলেই দেখা করতে হবে।

মাকে বিজিত খুবই ভালবাসে, কিন্তু তার বাবাকে ভালবাসার ধরনই আলাদা। বাবা বিজিতের কাছে আদর্শ পুরুষ। তার চিন্তা-ধারা, কর্মপদ্ধতি বিজিতের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কিছুটা তার অলক্ষ্যে, আবার কিছুটা বিজিত নিজেই আহরণ করেছে।

রসায়নের ছাত্র হলে হবে কি, উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে বাবার যথেষ্ট জ্ঞান।

আঠা দিয়ে খাতার পাতায় পাতাগুলো আটকাবার কাজে ব্যাপৃত থাকলেও বিজিতের কান রইল রাস্তার দিকে।

অফিসের গাড়ীর হর্ন তার জানা। ঠিক বাড়ির সামনে বাবাকে নামাবার সময় মোটর একবার হর্ন দেয়।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এল, তবু বাবার দেখা নেই। বাবা কিন্তু এত দেরী করেন না। অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসেন। ক্লাব বা বিশেষ কোন আড্ডা তাঁর নেই। কোন সহকর্মী ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমনও বিজিতের কোনদিন মনে হয় নি। জীবনের পথ বাবা মেপে রেখেছেন। একভাবে চলেন সেই পথ ধরে। সেই নির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তার সঙ্গে কথা বলেন। তাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়।

আর একটু রাত হতে বিজিত নীচে নেমে এল।

বাইরের ঘরের জানালায় মা দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল তিনিও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

—'মা।'

বিজিতের গলা মায়ের কানে গেল না।

বিজিত আরও এগিয়ে মার পিছনে দাঁড়িয়ে বলল—'বাবার তো এত দেরী হয় না, মা।'

—'কি জানি তাই ভাবছি।'

—'মোড়ের ফার্মেসী থেকে অফিসে একবার ফোন করে দেখব ?'

—'এত রাত পর্যন্ত কি আর অফিসে থাকবেন।'

—'তবে!'

এ তবের উত্তর মায়ের জানা নেই।

শহর কলকাতার মোড়ে মোড়ে সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে। একটা মানুষের পরমায়ু এ শহরে খুব মূল্যবান কিছু নয়। আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা কিছু বলা যায়!

কি করবে বিজিত যখন ভাবছে, তখন মোটর এসে দাঁড়াল।

বাবা মোটর থেকে নেমে, মোটরের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে কথা বললেন।

বাবাকে খুব ক্লান্ত মনে হ'ল। টাইটা একপাশে সরে গেছে। মুখে চোখে ক্লান্তির ছাপ।

বাবা ঘরের মধ্যে পা দিতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন—'কিগো, এত রাত হ'ল ?'

কোচে বসে বাবা ওপর দিকে দেখলেন। অর্থাৎ, পাখাটা যথেষ্ট জোরে ঘুরছে না।

বিজিত বুঝতে পারল। সে পাখাটা পুরোদমে চালিয়ে দিল।

মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি ?

খুব মৃদুকণ্ঠে বাবা বললেন, 'কমলবাবু অফিসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।'

'অসুস্থ ?'

'হ্যাঁ, কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে খবর দিয়ে কমলবাবুকে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়ে আসছি।'

মা দাঁড়িয়েছিলেন। বসে পড়লেন।

'কেমন আছেন এখন ?'

'ডাক্তাররা বলছেন চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না।'

'হঠাৎ ?'

'একেবারে হঠাৎ নয়। দিন তিনেক ভদ্রলোক খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। মনে হয় স্ট্রোকের কারণ সেই দুশ্চিন্তা।'

একটু থেমে বাবা আবার বললেন—

'তিন দিন হ'ল কমলবাবুর মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কণি। অত বড় মেয়ে হারাবে কি করে ?'

'হারায় নি। একজনের সঙ্গে বাড়ি ছেড়েছে।'

বাবা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বিজিতের দিকে চোখ পড়ায় নিজেকে সংযত করলেন।

এতক্ষণ বিজিতের উপস্থিতি সম্বন্ধে তার খেয়ালই ছিল না।

'তুমি কখন এলে বিজিত ?'

আজ সকালে। একদিন আগেই ফিরেছি।

'শরীর ভাল আছে ?'

বিজিত ঘাড় নেড়ে জানাল। ভালই আছে।

বাবা আর কোন কথা বললেন না। মাও কোন প্রশ্ন করলেন না। দুজনেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বিজিত বুঝতে পারল তার সামনে এঁরা কেউ এই নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবেন না।

পর্দা সরিয়ে বিজিত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল।

কণি কার সঙ্গে বাড়ি ছাড়ল।

অবশ্য কণির সব বন্ধুর সঙ্গে বিজিতের পরিচয় নেই, কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা তার অজানা নয়। কিছুক্ষণের জন্য তার জন্ম-দিনের পার্টিতে যোগ দিয়েই সে জীবনযাত্রার নমুনা বিজিত দেখেছে।

কোন লোকের সঙ্গে ঘর ছাড়ার আগে মনের প্রস্তুতির প্রয়োজন। ভালবাসার প্রশ্ন আছে। বিশেষ একজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা।

কেন বিজিত জানে না, প্রথমেই তার জিমি প্যাটেলের কথা মনে এল। টেনিসস্টার জিমি। তার সঙ্গেই কি কণি বাড়ি ছাড়ল?

কিন্তু বাড়ি ছাড়ার কি প্রয়োজন ছিল।

কণির মা আর বাবা তো যথেষ্ট উদারচেতা। সামাজিক সংকীর্ণতা তাঁদের মধ্যে নেই। মেয়েকেও তারা এইভাবেই মানুষ করেছেন। তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

কাজেই এখন হাহাকার করা অর্থহীন।

বিজিত আবার গাছের পাতার নমুনা নিয়ে বসল।

খাবার টেবিলে মা আর বাবা দুজনেই খুব গম্ভীর।

শেষদিকে আবহাওয়া তরল করার জন্য মা বাবাকে বললেন—
'বিজিতকে হাতি তাড়া করেছিল।'

'হাতি? জঙ্গলে? কি ব্যাপার?'

বাবা যেন খুব বিচলিত নন।

ঘটনাটা বিজিত আবার বলল।

পোষা হাতি বিশেষ ক্ষতি করে না। তোমরা বোধহয় এমনই ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।

বিজিত হাসল। কোন উত্তর দিল না।

খাওয়া শেষ হতে বাবা বলে উঠলেন, 'চল, কি স্পেসিমেন সংগ্রহ করে এনেছ, দেখি।'

বিজিতের সঙ্গে বাবা তার পড়ার ঘরে এসে ঢুকলেন।

তখনও গাছের পাতা সব আটকানো হয় নি। চারদিকে সব ছড়ানো ছিল।

খাতাটা টেনে নিয়ে বাবা চোখ বোলালেন। বিজিতের দু একটা লেখার ওপর মন্তব্যও করলেন।

তারপর কোন আবহাওয়ায় কি রকম গাছপালা দেখা যায় তা নিয়ে সরস আলোচনা। অনেক সময় প্রকৃতি ভেদে একই জাতের গাছের রূপান্তর হয়, তাও বললেন।

যে ফার্ণ তুমি মধ্যপ্রদেশে দেখেছ, সেই ফার্ণের চেহারা দার্জিলিং কিংবা শিলং-এ একেবারে অন্য রকম। তুমি বরং ই. রিচার্ডসনের "ফ্লোরাজ অ্যাণ্ড ফনাজ অফ ইণ্ডিয়া" বইটা জোগাড় করে পড়। অনেক ছবি আছে, ভাষাটাও বেশ প্রাঞ্জল।'

বিজিত বইয়ের নামটা লিখে নিল।

'ট্রেন জার্নি করে এসেছ, এবার শুয়ে পড়।'

বাবা বেরিয়ে যাবার পর বিজিত কিছুক্ষণ বসে রইল।

সে ভেবেছিল, মা আসবেন। অন্যদিনের মতন মাথার কাছে জল রেখে দেবেন, বিজিতের মশারি গুঁজে দিয়ে, বাতি নিবিয়ে চলে যাবেন।

কিন্তু মা এলেন না।

বাবাও উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে কি রকম দৃষ্টিতে বারবার বিজিতের দিকে যেন দেখলেন।

সে দৃষ্টিতে কি অবিশ্বাস।

অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ভয়।

আগের যুগের লোকদের সঙ্গে এ যুগের ছেলেদের কোথায় একটা দূরতিক্রম্য পার্থক্য রয়েছে।

বাবা কি ভাবছিলেন, হয়তো একদিন বিজিতও কাউকে নিয়ে ঘর ছাড়বে। মা বাপের অগোচরে!

বিজিত উঠে খাতাপত্র ঠিক করে রেখে, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

দিন পনের কুড়ি বিজিত আর অন্যদিকে নজর দেবার অবকাশ পেল না।

কলেজে পুরোদমে ক্লাশ শুরু হয়ে গেল।

তার মধ্যে এইটুকু খবর পেল, কমলবাবু আগের চেয়ে ভাল আছেন। কণির কোন খবর নেই।

বাবা প্রায় রোজই নার্সিংহোমে যেতেন। এক শনিবার বোধহয় মাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

কমলবাবু বাড়ি ফিরে এসেছেন শীঘ্রই অফিসে যোগ দেবেন।

এ বিষয়ে বিজিতের আর বিশেষ আগ্রহও ছিল না।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির চাতালে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

কলেজ ফেরত বিজিত লাইব্রেরিতে উঠছিল, দেখল চাতালে দু'টি তরুণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

বিজিত এগোতেই পিছন থেকে কে ডাকল, 'বিজিতবাবু।'

বিজিত ফিরে দেখল, বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরা তরুণীটি তার দিকে আসছে, আর সাদা শাড়ী পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে।

একটু এগোতেই বিজিত চিনতে পারল।

নীলা! কণির দিদি।

কাছে এসে নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রোজ আসেন বুঝি?'

'রোজ হয়ে ওঠে না। সপ্তাহে দিন তিনেক আসি। আপনি ?'

নীলা হাসল 'আমার জ্ঞানস্পৃহা খুবই কম। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সময় আর কাটতে চায় না, তাই কাল থেকে এখানে আসছি।'

এরপর কি বলা যেতে পারে বিজিত ভেবে পেল না।

তার আগেই নীলা বলল, 'এখন তো পড়তে আরম্ভ করবেন, তাই না ? ভাল ছেলেদের আমার বড় ভয় করে। চারপাশে বইয়ের স্তূপ সাজিয়ে তার মধ্যে নিজেরা অদৃশ্য হয়ে যায়।'

একটু ইতস্তত করে বিজিত বলল, 'আপনি নিজেও তো খুব ভাল মেয়ে।'

'পরীক্ষার রেজাল্ট বের হক, তাহলেই জানতে পারবেন।'

একটু থেমে নীলা বলল, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো ?'

'না না, মনে করবার কি আর আছে। বলুন।'

একটা দিন পড়া থাক, চলুন লনে গিয়ে বসি।

বিজিত লনের দিকে চেয়ে দেখল।

পুষ্পের সমারোহ। নানা জাতের নানা বর্ণের। সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ লন। পশ্চিম দিগন্তে আবির ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। লোভনীয় পরিবেশ।

অবশ্য একটা বিকাল নষ্ট হবে। সেটা খুব মারাত্মক নয়। আর একদিন বেশীক্ষণ থেকে ক্ষতিপূরণ করা যাবে।

নীলা ডাকছে। তাকে না বলাও ভদ্রতাসম্পন্ন হবে না।

দু'জনে লনের ওপর বসল।

নীলাই প্রথমে বলল। একেবারে বিনা ভূমিকায়—

'কণির কথা শুনেছেন ?'

একটু ইতস্তত করে বিজিত বলল, 'শুনেছি মানে, কণির বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, বাবার কাছে সেটা শুনেছি। তাঁর অসুস্থতার কারণও জেনেছি। কণির কোন খবর পাওয়া যায় নি ?'

—'কেন যাবে না। কণি তো চিঠি লিখে সব জানিয়েই গিয়েছি।'

—'তবে? তবে উনি এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন?'

—'অসুস্থতার কারণ অন্য।'

সবটা যেন রহস্যাবৃত মনে হচ্ছে। কণি যদি সব লিখেই গিয়েছিল, তাহলে অযথা এ চিন্তার কারণ কি। এমন হ'তে পারে কণি যার সঙ্গে বাড়ি ছেড়েছে, পাত্র হিসাবে সে কণির মা বাপের মনঃপূত নয়।

কিন্তু অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানো সমীচীন নয় বলে বিজিত চুপ করে রইল।

নীলা যেটুকু বলবে সেটুকুই শুনবে। অন্যায় কৌতূহল দেখাবে না।

নীলা নিজের মনেই বলল।

'সবই তো মাসিমা আর মেসোমশাইয়ের দোষ। অসীম মৌলিককে দেখে দু'জনে একেবারে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন।'

—"অসীম মৌলিক!"

—'হ্যাঁ, যার সঙ্গে কণি চলে গেছে।'

অসীম মৌলিকের সঙ্গে কণি চলে গেছে, জিমি প্যাটেলের সঙ্গে নয়? অবশ্য কণির পরিচিত সব বান্ধবকে বিজিত চেনে না। কণিকেই বা কতটুকু চেনে। কয়েকটা দিনের মাত্র আলাপ।

—'আমার কিন্তু প্রথমেই সন্দেহ হয়েছে, লোকটা বোগাস। কেবল বড় বড় কথা। সারা য়ুরোপ বার তিনেক ট্যুর করেছে। খুব বিখ্যাত আর্টিস্ট। প্যারীতে, রোমে নাকি তার ছবির একজিবিশন হয়েছিল। দু হাতে টাকা ছড়ায়। মেসোমশাইয়ের জন্য দামী সুটের কাপড়, মাসিমার জন্য বিদেশী কসমেটিকস্, কণিকে দামী পাথরের হার। সে কি কাণ্ড। মাসিমা আর মেসোমশাই অসীম মৌলিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'তাহলে আপনার মেসোমশাই আঘাত পেলেন কেন?'

প্রশ্নটা বিজিত না করে পারল না।

—'পরে খবর পেয়েছেন অসীম মৌলিক বিবাহিত। শ্রীরামপুরে তার স্ত্রী আছে, তুই ছেলে আছে।'

—'তাহলে এরকম করে লাভ।'

নীলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'লম্পট কি অত লাভ-লোকসানের হিসাব করে। সে শুধু বর্তমানটুকুই দেখে। কণি একগাদা গয়না পরে, বাপের পনের হাজার টাকা নিয়ে গেছে।'

বিজিত কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

একটা প্রজাপতি লালচে ফুলের ওপর বসতে গিয়েও বসছে না। ফুলকে ঘিরে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

ভয় পাচ্ছে। কিসের ভয়। প্রবঞ্চনার? ফুল তাকে ঠকাবে।

এক সময়ে বিজিত আস্তে আস্তে বলল, 'কণিরা এখন কোথায়?'

'কি জানি, চিঠিতে তো লিখেছিল বম্বে যাচ্ছে। হয়তো বম্বে যায়নি, অসীম তাকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে।'

'অসীম মৌলিক যে বিবাহিত সে খবর কি করে জানা গেল?'

'মেসোমশাই একটা উড়ো চিঠি পেয়েছিলেন। আমার বাবাকে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। বাবা শ্রীরামপুর গিয়ে সব খোঁজ এনেছেন।'

তু হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে বিজিত চুপচাপ বসে রইল।

এসব নিয়ে আলোচনা করতে তার ভাল লাগছে না।

স্কুল জীবনে পৃথিবী যত সরল, যত মধুর মনে হয়েছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবী একটা গোলোকধাঁধা। একবার পথভ্রষ্ট হলে আর পথ খুঁজে পাওয়া দায়। চারদিকে অসৎ, ফন্দীবাজ লোকেরা ঘুরছে। হাতে তাদের ফাঁদ। একবার সেই ফাঁদে পা দিলে আর রক্ষা নেই। অধঃপতনের অতলে টেনে নিয়ে যাবে।

'আমার নিজের মাসতুতো বোন, বলা উচিত নয়, তবু এ রকম একটা শিক্ষা যেন ওর পাওনা ছিল।'

খুব চড়া গলায় কথাটা শুরু করলেও শেষদিকে নীলার চোখ দুটো চকচক করে উঠল জলে।

বোঝা গেল সে নিবিড়ভাবে কণিকে ভালবাসে। কণির এই সর্বনাশে সেও বড় কম আঘাত পায়নি।

কি বোকা মেয়ে, সত্যি। কতবার বলেছি, কণি নিজেকে ফেরা। এরকম ফাস্ট লাইফ জীবনে সুখ আনে না। উল্টে আমাকে ব্যাকডেটেড্ বলে ঠাট্টা করেছে।'

অল্প অল্প করে অন্ধকার হয়ে আসছে।

বিজিত ঠিক করল এবার ওঠার কথা বলবে।

ঠিক সেই সময়ে নীলা বলল, 'আপনি খুব বেঁচে গেছেন।'

'আমি? কেন?'

'মেসোমশাই আর মাসিমার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার হাতে কণিকে দেবার।'

বিজিত এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে কোন কথাই বলতে পারল না।

শুধু কণির মা বাপের ইচ্ছাই কি সব? বিজিতের স্বতন্ত্র কোন মত থাকতে পারে না? বিজিতের মা বাপের সম্মতির প্রয়োজন নেই!

'অবশ্য আপনার বাবা রাজী হননি। মেসোমশাইকে বলে দিয়েছিলেন, আপনার বিয়ের কথা এখনই তিনি ভাবছেন না। কণিরা অপেক্ষা করতেও রাজী ছিল, তাতেও আপনার বাবা বলেছেন, অপেক্ষা করাটা উচিত হবে না। আপনি বড় হলে, আপনার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচি গড়ে উঠবে, তখন আপনি কি রকম মেয়ে পছন্দ করবেন, তা তাঁদের জানা নেই।'

কথাগুলো শুনে বিজিতের খুব ভাল লাগল। বাবা চিরদিনই

স্থিতধী, সুবিবেচক। খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। অন্যের অমর্যাদা অসম্মান না করে নিজের মতে অটল থাকার কৌশল তাঁর জানা।

উঠে দাঁড়িয়ে বিজিত বলল, চলুন, ওঠা যাক। আজ বিকালটা কিন্তু নষ্ট হ'ল।

'নষ্ট? কেন?'

'কেবল কণির কথাই হ'ল, আপনার কথা কিছু জানা।'

অন্ধকার নেমেছে, না হলে বিজিত দেখতে পেত, নীলার দু গালে আবিরের ছোপ।

সে মাথা নীচু করে বলল, 'জানবার মতন কোন কথা আমার নেই। আমি সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরেব মেয়ে। বাবা বেসরকারি অফিসের কেরাণী। মা-বাপের একটি সন্তান বলেই কোনরকমে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছি। বি. এ. যদি পাশ করতে পারি, তাহলে বি. টি. পড়ব। তারপর কোন মেয়ে স্কুলের শিক্ষিকা। অনটনের সংসারে বাড়তি রোজগারের ছিটেফোঁটা।'

বিজিতের মনে হ'ল নীলা সত্যি কথাই বলছে। বিনয়ে নিজের পারিবারিক মান নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে না।

'আপনি বাড়ি যাবেন তো?' বিজিত জিজ্ঞাসা করল।

নীলা বলল, 'আপনি যান, আমি এখন যাব না। আমার বান্ধবী লাইব্রেরির মধ্যে রয়েছে, তার সঙ্গে যাব।'

বিজিতের উত্তরের অপেক্ষা না করেই নীলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, বাসের মধ্যে বসে বিজিত ভাবতে লাগল। মাকে গিয়ে কণির কথা বলতে হবে। কণির কথা বলতে হ'লে মাকে নীলার কথাও বলতে হবে। নীলার সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে সে কথা মাকে বলা হয়নি।

গলির মোড়ে নেমে বিজিত ঠিক করল কিছুই বলবে না। একটা

কথা বললে তার সূত্র ধরে অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই সমীচীন।

তা ছাড়া, কণির জন্য বিজিতের মা বাপের কোন উদ্বেগ নেই। বিজিতেরও নয়।

আজকাল আর প্রাইভেট টিউটর আসে না। বিজিতের দরকার হয় না। বিজিত নানা বই ঘেঁটে যে নোটস্ লিখে আনে, তাইতেই যথেষ্ট কাজ হয়।

খাতায় বটানির স্কেচ করতে করতে বিজিত থেমে যায়।

অনেকগুলো মেয়ের কথা মনে পড়ে।

শমিতা, কণি, নীলা। মাঝে মাঝে কেয়া সেন। না, কেয়া সেন নয়, শুধু তার স্পর্শের অনুভূতি।

সহপাঠীরা নানা কথা বলে।

কার কোন মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, তাই নিয়ে রসিকতা।

এমন কি অধ্যাপকদেরও বাদ দেয় না।

ছোকরা অধ্যাপক, ডক্টর অনন্ত বসাক পড়াতে পড়াতে বার বার যে মেয়েটির ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেন, সে দীপালি পাল।

অপূর্ব সুন্দরী। যে মোটরে কলেজে আসে, সেটাও দেখবার মতন। বাপ বিরাট ধনী। বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়েই ফরেনে থাকেন।

সবাই হাসে। কত টাকা মাইনে পাও তুমি অধ্যাপক বসাক, এত উঁচুতলার মেয়ের দিকে উদ্বাহু বামনের মতন হাত প্রসারিত করে আছ। তুমি কি জান না, দীপালি পাল ম্যাক্সমুলার ভবনে কলেজের পরে যায়, জার্মান ভাষা শিখতে নয়, ফন গুডরাফের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

আগে সহপাঠীদের এসব কথা বিজিতের ভাল লাগত না। সে সরে আসত। আজকাল সরে আসে না। বসে বসে শোনে। অবশ্য কোন কথা বলে না।

একদিন কলেজের পর বিজিত সোজা বাড়ি এল না। সেদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাবার কথা নয়।

বিজিত গড়িয়াহাটের মোড়ে নামল।

কয়েকদিন ধরে একটা তোয়ালে কেনার কথা ভাবছে, কিন্তু রোজই ভুলে যাচ্ছে।

যে দোকান থেকে সে সচরাচর এসব জিনিস কেনে, সেখানেই ঢুকল।

ঢুকেই মনে হল, ভুল করেছে।

সামনে এক দঙ্গল মেয়ে শাড়ী বাছাবাছি করছে।

বিজিতের অভিজ্ঞতা আছে, এমন ক্ষেত্রে সেলস্‌ম্যানেরা অন্য কারো দিকে বিশেষ নজর দেয় না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

বিজিত ফিরে আসছিল হঠাৎ কে ডাকল, 'বিজিত।'

ক্ষীণ কণ্ঠ।

বিজিত ঘুরে দেখল দোকানের এক কোণ থেকে কণির মা এগিয়ে আসছেন। সাজসজ্জা করেছেন বটে, কিন্তু চেহারায় সে জৌলুস আর নেই। চোখের কোলে কালির ছাপ। গালে মুখে কুঞ্চনের রেখা।

বিজিত এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল।

'মেসোমশাই কেমন আছেন?'

'তুমি শোন নি কিছু?'

বিজিত ভয় পেল। চরম খবর কিছু আছে নাকি। না, তাহলে তো সে সর্বনাশের ছায়া মহিলার সাজপোষাকেও পড়ত।

'মেসোমশাইয়ের অসুস্থতার খবর শুনেছি।'

কণির মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এখন উনি খুব অসুস্থ। অফিস ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িতেই শুয়ে থাকেন। প্রায় পঙ্গু।

বিজিত ভাবল, কণির বাপের অফিস ছাড়ার খবর তো সে পায়নি। তার বাবা তাকে কিছু জানান নি।

অবশ্য তাকে জানাতেই হবে, এমন কোন কারণ নেই।

মাকে নিশ্চয় বলেছেন।

'ঠিক আছে, মেসোমশাইকে একদিন দেখতে যাব।'

'যেও বাবা। লোকজন গেলে উনি খুব খুশী হন। আমি বলব তোমার কথা।'

তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কণির মা প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, 'মুখপুড়ি আমাদের সর্বনাশ করে গেল। গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল সংসারটা।'

দোকান থেকে নেমে বিজিত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল।

শোক মানুষকে বদলে দেয়। তার বাইরের আবরণ ছিঁড়ে রিক্ত কাঠামোটা প্রকট করে তোলে।

কণির মায়ের কত পরিবর্তন হয়েছে!

বিজিত আর কোন দোকানে ঢুকল না। রাস্তার ওপর এক দোকান থেকে একজোড়া তোয়ালে কিনল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিজিতের মনে হ'ল কণির বাবার শরীরের এ অবস্থার কথা তো নীলাও বলে নি।

রাত্রে খাবার টেবিলে বিজিত বলল।

একপাশে বাবা, অন্য পাশে মা।

—'মাসিমার সঙ্গে দেখা হল!'

—'কে মাসিমা?'

বিজিতের মা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

কণির নামটা এড়িয়ে বিজিত বলল।

—'কমলবাবুর স্ত্রী।'

—'কোথায়?'

—'গড়িয়াহাটের মোড়ে কাপড়ের দোকানে। বললেন,

মেসোমশাই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িতেই রয়েছেন। অবস্থা খুব ভাল নয়।'

এতক্ষণ বাবা কোন কথা বলেন নি। একমনে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এবার মুখ তুলে বললেন, 'স্ট্রোকে মিস্টার গাঙ্গুলীর বাঁ দিকটা অবশ হয়ে গেছে। ইলেকট্রিক ট্রিটমেণ্ট করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ উপকার পান নি।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ের খবর পেয়েছেন ?'

'কি জানি, সে সব কথা আমি তুলি নি। কমলবাবুর স্ত্রী তো কিছু বলেন নি।'

কথা শেষ করে বাবা বিজিতের দিকে চোখ ফেরালেন।

বিজিত বুঝতে পারল, এসব কথা বাবা তার সামনে বলতে চান না।

বিজিতের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

সে উঠে দাঁড়াল।

'তোমার, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?'

'মন্দ নয়।'

'বেশ মন দিয়ে পড়। মনে রাখবে, যেমন করেই হ'ক জীবনে উন্নতি করতে হবে। সকলের মধ্যে একজন হওয়ার কোন দাম নেই। বিশিষ্ট হতে হবে। অন্যতম নয়, অনন্য।'

চুপ করে বিজিত শুনল, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পড়ার টেবিলে বসে বার বার উচ্চারণ করল।

মানুষ হতে হবে। ভীড়ের মধ্যে মিশিয়ে থাকলে কেউ মর্যাদা দেবে না। সকলের চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

এই সব মেয়েরা বাধা। শমিতা, কণি আর নীলার দল।

এদের যেমন করেই হোক, এড়িয়ে যেতে হবে।

দিন পনের পর।

ছুটির দিন। খুব ভোরে উঠে বিজিত পড়তে শুরু করেছে। সামনে পরীক্ষা।

যদিও এ শুধু ক্লাশের পরীক্ষা। তবু পরীক্ষা পরীক্ষাই।

দুধের কাপ হাতে মা ঘরে ঢুকলেন।

বিজিত অবাক।

'একি, তুমি নিয়ে এলে কেন মা? আমাকে ডাকলেই যেতাম।'

দুধের কাপ টেবিলের ওপর রেখে মা একটা চেয়ার টেনে পাশে বসলেন।

'তোর সঙ্গে একটু কথা আছে বিজিত।'

বইটা সরিয়ে রেখে বিজিত বলল, 'কি কথা মা।'

'তাড়া নেই। তুই দুধটা খেয়ে নে। বলছি।'

খাওয়া শেষ করে বিজিত বলল, 'বল।'

'ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বাইরে গেলে তোর খুব অসুবিধা হবে?'

'না, অসুবিধা কিসের! আজ তো ছুটি। দুপুরে পড়তে পারব।'

'আমায় কালীঘাটে নিয়ে যেতে পারবি?'

'কালীঘাটে? আজ কি মা?'

'কি আবার। মায়ের কাছে যাব তার আবার দিনক্ষণ কিসের?'

'বাবা জানেন?'

'জানবে না? কালই বলে রেখেছি।'

বিজিত হেসে উঠল। এ হাসির কারণ আছে।

আর একবার কথায় কথায় বাবা বলেছিলেন, 'কি রকম ভক্তি তোমার। উজান বেয়ে কালীর মন্দিরে যেতে হবে? মাকে দরজায় আনতে পার না।'

মা শুধু বিস্মিত নয়, ভীতও হয়েছিলেন।

মানুষটা সব কিছু বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখে। ভক্তিশ্রদ্ধাও মাইক্রোসকোপের তলায় রেখে বিশ্লেষণ করতে চায়।

বাবা বলেছিলেন, 'শঙ্করাচার্য আর জয়দেব নিজেদের আরাধ্য নদীকে সান্নিধ্যে এনেছিলেন। এই না হলে ভক্তি।'

বাবা যে মারাত্মক কিছু বলেন নি, তা শুনে মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

মায়ের তৈরি হতে হতে নটা বেজে গেল।

চৌরাস্তায় এসে মা বললেন, 'একটা ট্যাক্সি ডাক, বিজিত। ট্রামে বাসে ওঠা আমার সাধ্যে কুলাবে না।'

ট্যাক্সি পাওয়া প্রায় লটারিতে টাকা পাওয়ার সামিল।

বিজিতের ভাগ্য ভাল। একটু অপেক্ষা করতেই ট্যাক্সি জুটে গেল।

মন্দিরের কাছাকাছি যেতেই লোকের ভীড়ে ট্যাক্সি আটকে গেল।

নেমে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বিজিত নামল। মাকেও নামাল।

তারপর ভীড় ঠেলে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল।

ভিতরে জনারণ্য। কালীর মুখ দেখার উপায় নেই।

মা নাটমন্দিরে বসে পড়লেন।

—'ভীড় একটু কমুক বিজিত। আমি এখানে বসলাম।'

একটু পরেই একজন পাণ্ডা এসে দাঁড়াল।

—'আসুন মা, একেবারে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দর্শন করিয়ে দেব। ভীড়ের আঁচড় গায়ে লাগবে না।'

মা প্রশ্ন করলেন, 'কত দিতে হবে তোমায়?'

—'পাঁচ টাকা দেবেন মা। আপনি তো রাজরাণী। এতো আপনার হাতের ময়লা।'

তিন টাকায় রফা হল।

পাণ্ডা ভিতর দিয়ে তাদের একেবারে বিগ্রহের কাছে নিয়ে গেল।

পূজার নির্মাল্য নিয়ে চলে আসতে গিয়েই মা থেমে গেলেন।

কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছিল, এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

বিজিত পিছনেই ছিল।

মা বললেন, 'বিজিত, দেখত রে, অন্ধকারে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বিজিত একটু কাত হয়ে দেখল।

মেয়েটির দুটি হাত জোড় করা। নিমীলিত চোখ। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। বোধহয় মায়ের কাছে কিছু নিবেদন করছে।

শমিতা আরও শীর্ণ হয়ে গেছে। আরো অসুন্দর।

ফিস ফিস করে বিজিত বলল, 'শমিতা।'

'তাহলে আমি ঠিকই দেখেছি। মেয়েটার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

বিজিত কোন কথা বলল না।

মা বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন।

কেন দাঁড়ালেন বিজিত যে একেবারেই বোঝেনি, এমন নয়। তবু প্রশ্ন করল, 'দাঁড়ালে কেন মা?'

'মেয়েটার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই।'

একটু পরেই শমিতা এল। সঙ্গে কেউ নেই। একেবারে একলা।

দরজার একপাশে দাঁড়ানো বিজিত আর তার মাকে দেখতেই পেল না।

মা পিছন থেকে 'শমিতা' বলে ডাকতে শমিতা চমকে মুখ ফেরাল।

দ্রুতপায়ে কাছে এসে হেসে বলল, 'আরে আপনি! কেমন আছেন?'

'আমি ভাল আছি। কিন্তু তোমার শরীর এত খারাপ হয়ে গেছে কেন?'

শমিতা আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, 'কিছুদিন আগে প্যারা-টাইফয়েড হয়েছিল। শরীর এখনও একটু দুর্বল।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে শমিতা নীচু হয়ে বিজিতের মায়ের পায়ের ধূলো নিল।

মা একটা হাত রাখলেন তার মাথার ওপর।

'দিদির কাছেই আছ তো?'

'দিদির কাছে? না।'

'তবে?'

শমিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি শ্রীরামপুরে আছি। দূর সম্পর্কের এক পিসির কাছে।'

'দিদি? দিদি কোথায়?'

'আগে বালিতে থাকত। এখন কোথায় আছে জানি না।'

'সে কি, দিদির সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ নেই?'

বিজিতের মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে শমিতা ক্লান্ত দুটি চোখ তুলল। ঠোঁটের প্রান্তে বিষণ্ণ হাসির টুকরো।

থেমে থেমে বলল, 'আমি চলি। আমাকে অনেকটা দূর যেতে হবে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে শমিতা হন হন করে এগিয়ে গেল। ভীড়ের মধ্যে তাকে আর দেখা গেল না।

বিজিত বলল, 'মা চল। বেলা বাড়ছে।'

মা পুজার নির্মাল্য হাতে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিজিতের কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেলেন।

কোন কথা না বলে ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন।

বিজিত ট্যাক্সির খোঁজে এদিক ওদিক দেখল।

ট্যাক্সি কোথাও নেই।

'মা আর একটু এগিয়ে চল।'

'উঁ?'

মা যেন এ জগতে নেই।

বিজিত বুঝল। কিছু বলল না।

এগিয়ে গেল। একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল মা-ও পিছন পিছন আসছেন।

ট্যাক্সি একটা পাওয়া গেল শেষপর্যন্ত।

মোটরের মধ্যে কোন কথা হ'ল না। বিজিত শুধু আড়চোখে দু-একবার মাকে দেখল।

মায়ের সেই এক তন্ময় ভাব।

বাড়ি ফিরে দেখল বাবা নেই। বেরিয়েছেন।

এত বেলায় বের হবার কথা নয়।

বিজিত আর তার মা দুজনেই একটু আশ্চর্য হল।

কাবকের মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বলল, 'বাবুর কোন বন্ধুর খুব বাড়াবাড়ি, তাই চলে গেলেন। আর একজন মোটর নিয়ে এসেছিলেন।'

ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। কার আবার কি হ'ল!

নিজের ঘরে ঢুকেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বিজিত, বিজিত।'

বিজিত মুখ হাত ধোবার জন্য বাথরুমে ঢুকছিল, ডাক শুনে দ্রুতপায়ে মায়ের ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

মা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা চিরকুট। মুখ পাংশুবর্ণ।

মায়ের এ অবস্থা দেখে বিজিত ভয় পেল। তার মনে হল, নিশ্চয় বাবার কিছু হয়েছে। বাজার থেকে ফেরার মুখে কোন দুর্ঘটনা।

'কিসের কাগজ?'

চেষ্টা সত্ত্বেও বিজিতের গলা কেঁপে উঠল।

মা চিরকুটটা এগিয়ে দিলেন।

'পড়।'

বিজিত পড়ল:

কমল গাঙ্গুলী মারা গেছেন। আমি যাচ্ছি।

তলায় কোন নাম নেই। কিন্তু বিজিত বাবার হাতের লেখা চেনে।

চিরকুটটা টিপয়ের ওপর রেখে সে খাটের ওপর বসল।

'কণির বাবা মারা গেছেন।'

এই মুহূর্তে এ ছাড়া বলার আর কিছু পেল না।

মা আস্তে আস্তে এসে খাটের ওপর বসলেন। বিজিতের পাশে। বললেন, 'ওদের সংসারটার কি হবে তাই ভাবছি।'

বিজিত মাকে দেখল। তখনও তাঁর হাতে নির্মাল্য ধরা রয়েছে।

একটু অপেক্ষা ক'র বিজিত বলল, 'বাবার কাছে শুনেছি কণির বাবার অনেক টাকা।'

মা মাথা নাড়লেন, 'যেভাবে ওঁরা চলতেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে, তাতে খুব যে কিছু আছে এমন মনে হয় না।'

এক সময় বিজিত উঠে দাঁড়াল। মা-ও অনেকটা সহজ হয়ে গেছেন।

বাবা ফিরলেন সন্ধ্যার পর।

রোজ বিকালে বিজিত বের হয়। পার্কে পায়চারি করে। সেদিন আর বের হল না।

সকাল থেকে দিনটা খারাপ কাটছে।

শমিতার সঙ্গে দেখা না হলেই যেন ভাল ছিল। তারপর এই চরম দুঃসংবাদ।

বাবা বিশেষ কোন কথা বললেন না। রীতিমত গম্ভীর।

বোঝা গেল সহকর্মীর মৃত্যু তাঁকে খুবই নাড়া দিয়েছে।

দিন চার-পাঁচ পর মা এসে বিজিতের ঘরে ঢুকলেন।

'বিজিত।'

'মা।'

তোমার বাবা বলছেন আমাদের একবার কণিদের ওখানে যাওয়া উচিত।

'আমিও যাব ?'

'বলছেন যখন চল।'

বিজিত আর কিছু বলল না। পোশাক বদলে নিল।

শোকাবহ এমন পরিস্থিতিতে যেতে তার মোটেই ভাল লাগে না।

কিন্তু বাবা যখন বলছেন, তখন আর কথা নেই।

ট্যাক্সি যখন প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে ঘুরল, বিজিত আশ্চর্য হল।

চেতলা। পোল পার হয়ে বাঁ দিকে একটা গলির মধ্যে।

অপরিসর গলি। আলোরও তেমন জোর নেই। কাছে এক কারখানা থেকে একটানা টিন পেটার শব্দ আসছে।

হঠাৎই বিজিতের মনে পড়ে গেল কণির জন্মদিনের চড়া অর্কেস্ট্রার আওয়াজ।

যে বাড়িটায় বিজিতের বাবা ঢুকলেন তার দেয়াল নোনা ধরা, মেঝে স্যাঁতসেঁতে। ছাদে হাজার ফাটল।

একটা খাটের ওপর কণির মা শুয়ে। তার পাশে বসে যে তাকে বাতাস করছে, তাকে দেখে বিজিত বিস্মিত হল।

এ কে, কণি ? না কণির কঙ্কাল।

সিঁথি সাদা। পরনে সাধারণ শাড়ি। হাতে গলায় দু-একটা অলঙ্কার। বিজিতদের দেখে পাখা ফেলে কণি পাশের ঘরে চলে গেল।

ঘরে যে একটি মাত্র চেয়ার ছিল তাতে বিজিতের বাবা বসলেন।

বিজিতের মা খাটের একপাশে।

বিজিত দাঁড়িয়ে রইল।

কণির মা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'বিজিত, বস বাবা। খাটের ওপর বস।'

বিজিতের বসার জন্যই যেন কণির মা নিজের পা দুটো গুটিয়ে নিলেন।

বিজিত বসল।

বিজিতের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি করবেন ঠিক ক'রেছেন?'

'ওঁর কাজটা হয়ে গেলে বাইরে দাদার কাছেই চলে যাব। এখানে এ শহরে থেকে আর লাভ কি।'

'কিন্তু পাড়াগাঁ বললেন না? সেখানে গিয়ে থাকতে কষ্ট হবে না?'

কণির মা ম্লান হাসলেন।

'কষ্টের কথা আর ভাবছি না। এখন কোন রকমে থাকা। নিজের জন্য কোন চিন্তা করি না। গলার কাঁটা ফিরে এল। ওকে নিয়েই আমার যত জ্বালা।'

বিজিত বুঝতে পারল, কণির সম্বন্ধেই কথাটা বলা হ'ল। কণির বেশবাসে একটা রিক্ততার ছাপ। তবে কি কণিও বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে?

বিজিত ভেবেছিল, ওকে হয়তো কণির মা পাশের ঘরে যেতে বলবেন। যে ঘরে কণি রয়েছে।

কিন্তু তিনি কিচ্ছু বললেন না।

বিজিতের মা-বাবা কেউ কণির প্রসঙ্গ তুললেন না। বোধ হয় তাঁরা সবই জানেন।

বিজিতের বাবা প্রশ্ন করলেন, 'এখানে এভাবে আপনাদের থাকা। একটি পুরুষমানুষ নেই।'

কণির মা জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফেরালেন। ছোট চাপা জানলা। আকাশ দেখবার উপায় নেই। তাছাড়া আশপাশে

লোকেরা তোলা উনান ধরিয়েছে। তার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরে ঢুকছে।

'দাদা চিঠি পেয়েছেন। কাল দাদা-বৌদি এসে পড়বেন।'

আর বিশেষ কথা হল না।

এক সময়ে বিজিতের বাবা উঠে পড়লেন।

'আজ উঠি। মাঝে মাঝে আসব।'

'আসবেন দয়া করে। অফিসের আরও দু-একজন আসেন। আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।'

বিজিত ভেবেছিল, যাবার সময় কণি এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু না, কেউ এল না।

সরু গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় আসতে আসতে অদ্ভুত একটা ভাবনা বিজিতকে আচ্ছন্ন করল।

সুখ, সম্পদ, সমারোহ সবই তাসের ঘরের সামিল। দুর্দিনের দমকা হাওয়ায় কখন তাসের ঘর ধূলিসাৎ হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না।

শুধু একটা লোকের অভাবে এদের জীবনে কি গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। জীবনযাত্রার ধরনই বদলে গেল।

জিমি প্যাটেলরা আসে না? সম্পদের শুকপাখিরা রিক্ত ডালে বসতে আকৃষ্ট হয় না।

বিজিতের বয়স হচ্ছে। পৃথিবীর বিচিত্র গতি প্রকৃতির কথা তার অজানা নয়। অভিজ্ঞতাই তো বয়স। সে অভিজ্ঞতা যে শুধু নিজেকে নিয়ে এমন নাও হতে পারে। চোখ খুলে এদিক ওদিক দেখলে অনেক কিছু জানা যায়, বোঝা যায়।

আজ যদি বিজিতের বাবা সরে যান, তাহলে তাদের সংসারেরও কি একই অবস্থা হবে?

বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও তারা উঠে যাবে। আসবাবপত্র বিক্রি করে দিতে হবে। পাখা গুটিয়ে সরু ডালে বসে কোনরকমে জীবনযাত্রা নির্বাহ।

কণির বাবার কাজে বিজিত গেল না। তার মা আর বাবা গেলেন।

কণির মামা নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। বিজিত তখন কলেজে। সপ্তাহে তিনবার বিজিত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যায়, কিন্তু নীলাকে দেখতে পায় না। বোধ হয় নীলা আর যায় না।

নীলার সঙ্গে দেখা হলে কণির সম্বন্ধে অনেক কিছু বিজিত জানতে পারত। কেন এভাবে, এ বেশে কণি ফিরে এসেছে।

মাস চারেক পর।

কলেজ থেকে বের হয়েই বিজিত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফুটপাথের ওপর নীলা। তার সঙ্গে একটি মেয়ে।

নীলা বিজিতের দিকে পিছন ফিরে থাকায় তাকে দেখতে পায় নি। কিভাবে নীলার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ভাবতে ভাবতেই নীলা ফিরল।

বিজিতকে দেখে তার দুটো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একটু এগিয়ে এসে বলল, 'কি আশ্চর্য, দুজনে একই কলেজে পড়ছি, অথচ দেখাই হয় না।'

বিজিতের মনে পড়ে গেল, শেষবার যখন দেখা হয় তখন নীলা হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়েছিল।

'আপনার সাবজেক্ট কি?'

বিজিতের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে নীলা সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করে বলল, 'ঠিক আছে বিভা, তুই চলে যা। আমি পরে যাব।'

বিভা দুটি চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে একবার বিজিতকে, একবার নীলাকে দেখল, তারপর ঠোঁট টিপে হেসে রাস্তা পার হয়ে গেল।

'আমি ইতিহাসে অনার্স নিয়েছি।'

বিজিত হেসে বলল, 'আপনার পাশের খাওয়াটা কিন্তু বাকি আছে।'

নিজের প্রগলভতায় বিজিত নিজেই বিস্মিত হ'ল। আগে সে এভাবে কথা বলতে পারত না। মেয়েদের সঙ্গে তো নয়ই।

আজকাল পারে। বেশ স্বচ্ছন্দেই বলে।

নীলা বলল, 'বাকি থাকবে কেন, আসুন আজই হয়ে যাক।'

বিজিত মাথা নাড়ল, 'আরে না, না। আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

'আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। আসুন।'

আর কিছু না বলে বিজিত নীলার পিছন পিছন চলতে শুরু করল।

কলেজ স্কোয়ার পার হয়ে, ওদিকের রাস্তায় ছোট একটা রেস্তঁরায় নীলা ঢুকল। সঙ্গে বিজিতও।

'কি খাবেন বলুন, চা না কফি?'

বিজিত মাথা নাড়ল। কোনটাই নয়।

'কোনটাই নয়। তার চেয়ে বরং এক গ্লাস সরবত বলি। আমি ভাবছিলাম বলবেন, এক গ্লাস দুধ।'

'দুধ!'

'হ্যাঁ, আপনাকে দেখে দুগ্ধপোষ্যই মনে হয় কিন্তু।'

এ রসিকতার বিজিত কোন উত্তর দিল না।

বিজিত সুযোগ খুঁজছিল।

সরবত শেষ হলে সে বলল, 'কণির সঙ্গে দেখা হ'ল।' কথাটা বলেই বিজিত নিজেকে সংশোধন করে নিল। 'দেখা মানে, দেখলাম, মায়ের বিছানায় ব'সে আছেন। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

নীলা কোলের ওপর দুটো হাত জড়ো করে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে বসেছিল। সেইভাবেই বলল, 'রাস্কেলটা ওর টাকাপয়সা গয়নাগাটি সব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

হঠাৎ বিজিতের মুখ থেকে বের হয়ে গেল, 'ভালবেসে ঘর ছেড়েছিল।'

'ভালবাসার লোক ভুল করলে এই হয়। আমাদের মেয়েদের জীবনে এটাই মারাত্মক। সাবধান না হলেই মৃত্যু।'

'কণি তো আবার বিয়ে করতে পারেন। করাও উচিত।'

'পারে বৈকি। এ বিয়েটা তো আইন মতে সিদ্ধও ছিল না। কিন্তু যেটুকু বুঝলাম, ও বোধ হয় আর বিয়ে করবে না।'

'করবে না বিয়ে?'

'না, সমস্ত পুরুষজাতটার ওপর ওর ঘৃণা এসে গেছে। অবশ্য ওর বয়সও খুব বেশী নয়। জানি না, পরে কি করবে।'

আধ ঘণ্টার ওপর দুজনে বসে রইল। কিন্তু কণির কথা আর হ'ল না। কলেজের আলোচনায, নামকরা অধ্যাপক কারা আছেন, এ কলেজের একদা-ঐতিহ্য এই সব কথা।

প্রথমে নীলাই উঠে দাঁড়াল।

'চলি আজকে।'

বিজিত খুব আশা করেছিল, নীলা বলবে, সপ্তাহের কোন্ কোন্ দিনে বিজিতের কখন ছুটি। দুজনের কোথায় দেখা হতে পারে। কিংবা নিজের বাড়িতে একবার আমন্ত্রণ জানাবে।

কিন্তু সে-সব কিছু নয়।

নীলা সোজা ট্রাম-রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

বিজিতও ওইদিকেই যাবে। কলেজের পর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।

সে দাঁড়িয়ে রইল।

নীলা যখন চায় না, তখন তারও এভাবে নীলার সঙ্গে যাওয়া সমীচীন নয়।

তারপর অনেক দিন নীলার সঙ্গে দেখা হ'ল না।

এক কলেজ। চলতে ফিরতে দেখা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু দেখা হ'ল না।

নীলা কি কলেজ ছেড়ে দিল? কিংবা সে বিজিতকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। নীলাও কি কণির মতন পুরুষকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে!

বিজিত আর নীলার সম্পর্ক তো কোনদিন সে পর্যায়ের ছিল না।

বিজিত নিজের পড়াশোনায় মন দিল।

মাঝে মাঝে বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে অন্য কিছু সে ভাববার চেষ্টা করে। শমিতার কথা, কণির কথা, নীলার কথা।

এরা কেউ ঠিক তার জীবনে আসে নি, তবু মনে হয়, এরা যেন বিজিতের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

নীলার সঙ্গে তার দেখা হল প্রায় এক বছর পরে।

একটা বই কেনার জন্য বিজিত সাহেবপাড়ার এক বইয়ের দোকানে ঢুকেছিল, ঢুকেই দেখল বইয়ের র‍্যাকের সামনে নীলা। তার পাশে দীর্ঘ চেহারার এক ভদ্রলোক।

একটু ইতস্তত করে বিজিত বলল, 'কেমন আছেন নীলা দেবী?'

নীলা ফিরে দাঁড়াল।

নীলার দেহ আরও পুরন্ত হয়েছে। আরও সতেজ।

সিঁথির মাঝখানে সিঁদুরের গাঢ় রেখা।

—'আরে আপনি! আসুন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এই শোন।'

ভদ্রলোক একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। বইটা রেখে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোকের দিকে আঙুল দেখিয়ে নীলা বলল, 'ইনি হচ্ছেন আমার, কে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। 'বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি, জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।'

ভদ্রলোক হেসে দুটো হাত জোড় করে বললেন, 'আমার নাম ত্রিদিবেশ চট্টোপাধ্যায়।' তারপর নীলার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'এঁর পরিচয়?'

—'ইনি বিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র। উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়ছেন। কণির জন্মদিনের ফাংশানে আলাপ হয়েছিল।'

—'ও। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম।'

বিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'নীলা দেবী, আপনাকে তো আজকাল কলেজে দেখতে পাই না?'

নীলা মুচকি হাসল।

—'কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। এখন এঁর কাছে নতুন জীবনের পাঠ নিচ্ছি।'

বিজিতের মনে হ'ল শ্রাবণের ধারাবর্ষণে পরিপূর্ণ তটিনীর মতন নীলা উচ্ছল। জীবনের বুঝি নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে। বেঁচে থাকার নতুন সংজ্ঞা।

বেশীক্ষণ কথা হ'ল না।

ওদের সিনেমার তাড়া আছে। একটা বই বেছে নিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে ত্রিদিবেশবাবু বললেন, 'একদিন আসুন না আমাদের ওখানে। খুব খুশী হব।'

বিজিত দাঁড়িয়ে রইল।

ত্রিদিবেশবাবু যাবার আমন্ত্রণ জানালেন বটে, কিন্তু বাড়ির ঠিকানা বললেন না।

তার মানে এ শুধু সাধারণ ভদ্রতা। নিয়মরক্ষা মাত্র।

বিজিত যে বই খুঁজছিল, সেটা পেল না।

রাস্তায় নেমে বিজিতের মনে হ'ল সারা বুক জুড়ে একটা বিষাদের ভার। অনেক সময় এমন হয়, ঠিক কারণ বোঝা যায় না,

সূত্র ধরা যায় না, কিন্তু চাপ চাপ কুয়াশার মত দুঃখের একটা জমাট ভাব মন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

কিছুটা গিয়েই বিজিতের মনে হল, এমন তো নয়, যে নীলার বিয়ে হয়ে গেছে বলে তার মনের এই অবসাদ।

কিন্তু নীলার সঙ্গে তার তো এমন ধরনের সম্পর্ক কোনদিন গড়ে ওঠে নি।

অনেক গাছের যতটা দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে মাটির অন্ধকারে।

তেমনই অবচেতন মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হঠাৎ বোঝা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে যার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যহীন মনে হয়, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মন তার সম্পর্কেই অত্যন্ত আগ্রহী।

শমিতা, কণি আর নীলা। তার প্রথম যৌবনে এই তিনটি নারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

শমিতার সঙ্গে আলাপ মাত্র কয়েকদিনের। কণির জীবনদর্শনের সঙ্গে বিজিতের জীবনদর্শনের কোন মিল নেই। একমাত্র নীলার সঙ্গে নানাদিক দিয়ে কিছু সাদৃশ্য আছে।

নীলা শিক্ষিতা। পরিহাসপ্রিয়। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে।

বিজিত কি মনের গোপনে এমন একটি নারীর কথাই চিন্তা করেছিল।

কিছুক্ষণ পর বিজিত নিজের ওপরই বিরক্ত হ'ল।

ইদানীং মেয়েদের নিয়ে সে যেন বড় বেশী চিন্তা করছে। সামনে পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সাফল্যের ওপরই তার জীবনের উন্নতি নির্ভর করছে।

তারপর অনেকগুলো মাস বিজিত সব ভুলল। শুধু বই আর বই।

মা অনুযোগ করলেন, বিজিত, দিনরাত ঘরের মধ্যে বসে থাকিস,

শরীর খারাপ হবে যে। রোজ বিকালে পার্কে একটু বেড়াতে তো পারিস।

বিজিত কোন উত্তর দিল না। শুধু হাসল।

বাবা মাঝে মাঝে পড়ার ঘরে এসে দাঁড়ান।

'কেমন তৈরি হচ্ছে বিজিত?'

'চেষ্টা তো করে যাচ্ছি। দেখি কি হয়?'

'চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। ভালই হবে।'

বাবা কিছুক্ষণ টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়ান, তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে যান।

বিজিত লক্ষ্য করে।

বাবা যেন একটু কুঁজো হয়ে গেছেন। চোখের কোণে কালির ছাপ। এইটুকু উঠেই অল্প অল্প হাঁপান।

টেবিলের ওপর হাত রেখেছিলেন। মনে হ'ল হাতে শিরার জট যেন আরও বেশী।

বাবা চিরকাল সুপুরুষ। অনেকেই বলে বিজিত তার বাবার মতন হয়েছে। দীর্ঘ চেহারা, গৌরবর্ণ, পৌরুষমণ্ডিত মুখে দুটি নারীর চোখ।

বোঝা যায় না. নদীমুখে অল্প অল্প করে পলিমাটি জমার মতন আস্তে আস্তে দেহে বয়সের ভার নামে। প্রথমে আসে ক্লান্তি আর অবসাদ, তারপর স্নায়ু, শিরা ধীরে ধীরে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

আগে বাবা অফিসের পর সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখতেন। বই গোছাতেন, নিজের হাতে জিনিস সাজাতেন, উচ্চহাস্য করতেন কারণে অকারণে।

ইদানীং বিজিত লক্ষ্য করেছে অফিস থেকে ফিরে বাবা চুপচাপ কৌচের ওপর বসে থাকেন। কখনও কখনও বিছানায় আশ্রয় নেন। ঘরের আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

বিজিত মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, বাবার কি শরীর খারপ?'

'শরীর খারাপ? না, বয়স হচ্ছে, খেটেখুটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।'

বয়সও তো ব্যাধি।

পরীক্ষা হয়ে গেল।

কিছুদিন ধরে বিশৃঙ্খলা চলছিল। পরীক্ষার হলে ছাত্রদের তাণ্ডব নৃত্য। বেঞ্চ চেয়ার ভেঙে, প্রশ্নপত্র পুড়িয়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড।

কিন্তু বিজিতের ভাগ্য ভাল। তাদের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হ'ল।

এখন ফল কবে প্রকাশিত হবে তার জন্য প্রতীক্ষা।

সতীর্থরা অনেকেই কলকাতার বাইরে চলে গেল।

বিজিত মাকে প্রশ্ন করেছে, 'হ্যাঁ মা, আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নেই ?'

ইদানীং মা চশমা পরেন। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসেছিলেন, হেসে বললেন, 'কেন রে, আত্মীয়স্বজনের এত খোঁজ কেন ?'

'সবাই বাইরে যাচ্ছে। আমার কোন যাবার জায়গা নেই ?'

বিজিত অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

তবু মা তাকে কাছে টেনে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তোর বাবা হচ্ছেন তোর ঠাকুদার একমাত্র সন্তান। কাজেই কাকা কিংবা পিসি কিছুই তোর নেই। আমার অবশ্য এক বোন আছে, কিন্তু সে এমন জায়গায় যে তোর বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করবে না।'

'কোথায় মা ?'

'বাঁকুড়া। সে নিজেই চিররুগ্ন। বছরের মধ্যে আট মাস বিছানায় শুয়ে থাকে।'

'বাঁকুড়া।' বিজিত নাক সিঁটকাল, 'বাঁকুড়ায় আবার কেউ বেড়াতে যায় নাকি।'

বাবা অফিস থেকে ফিরতে মা বললেন, 'শুনছ, তোমার ছেলে যে কলকাতায় হাঁপিয়ে উঠেছে।'

'হাঁপিয়ে উঠেছে ?'

'হ্যাঁ, বলছে, এতদিন ছুটি। সবাই বাইরে যাচ্ছে।'

বাবা হাসলেন, 'ঠিক আছে, আমরাও দার্জিলিং যাব।'

'সত্যি যাবে ?'

হ্যাঁ, ছুটি তো নেওয়াই হয় না। ভাবছি একমাস ছুটি নিয়ে দার্জিলিং যাব। মাঝে মাঝে শরীর একটু বিশ্রাম চায়।'

বিজিতের মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন।

বিয়ের পর সেই যে কাজের শৃঙ্খলে বন্দী হয়েছেন, আজ পর্যন্ত মুক্তি মিলল না। অনেক বছর আগে, তখন বিজিত হয় নি, দিন দশেকের জন্য বিজিতের মা বোনের বাড়ি গিয়েছিলেন। সঙ্গে অবশ্য বিজিতের বাবাও ছিলেন।

তারপর আর কোথাও যাওয়া হয় নি।

বিজিত বেড়িয়ে ফেরার পর বাবা ডেকে পাঠালেন।

বিজিত দেখল, বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। দুটো হাত বুকের ওপর।

'বিজিত, ভাবছি একমাসের জন্য দার্জিলিং ঘুরে আসব।'

আনন্দে বিজিত কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না, তারপর একসময়ে রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলল, 'দার্জিলিং ?'

'হ্যাঁ, এই সময়টা ওয়েদার ভাল। ভারতবর্ষে জন্মাব, অথচ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব না। তা কি হয় !'

—'কবে যাবে ?'

—'কাল ছুটির বন্দোবস্ত করে আসব। সামনের সপ্তাহেই রওনা হয়ে যাব।'

বিজিতের মনে হ'ল এ যেন নতুন শহর। পশ্চিম বাংলার ভিতর অবস্থিত, এমন মনে হয় না।

থাকে থাকে সাজানো বাড়ি। সাপের মতন পাহাড়কে আবর্তন করে ঘুরে ঘুরে পথ চলেছে।

ম্যাল থেকে নেমে এক জায়গায় গিয়ে বিজিত স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ফার্ণের রাজত্ব। পৃথিবীতে এত রকমের ফার্ণ আছে বিজিতের জানা ছিল না। ব্যাগ ভর্তি করে সে ফার্ণের পাতা সংগ্রহ করল।

শহরে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যে সব ফুল সযত্নে টবে লালিত করে, সে সব ফুল এখানে পাহাড়ের কোলে অজস্র ফুটে আছে।

শুধু ফুটেই নেই, দিন পনের ধরে একভাবে থাকবে।

বাবা আর মা এত ঘোরাঘুরি করতে পারেন না। তাঁরা কোনদিন ম্যালের বেঞ্চে বসে থাকেন, কোনদিন হোটেলের উদ্যানে।

বিজিত এক একদিন এক এক জায়গায় যায়।

তবে তার সব চেয়ে ভাল লাগে বটানিক্যাল উদ্যান।

এটা যেন তারই মনের জগৎ। ফার্ণ তো আছেই, তা ছাড়া আছে হাজার রকমের পরগাছা।

ঠিক এখানেই দেখা হয়ে গেল।

একটা পাথরের ওপর বিজিত বসেছিল, কোলের কাছে অনেক রকমের গাছগাছড়া।

শব্দ হ'তে মুখ তুলে দেখল, সর্বনাশ।

এক সাহেব আর মেম ওপর থেকে নামছিলেন। সাহেবটির হাতে লাঠি। তিনি লাঠি ঠুকে ঠুকে আসছিলেন। মেমটি পাশে ছিলেন। হঠাৎ ছোট একটা পাথরে ঠোক্কর লেগে মেম গড়িয়ে পড়লেন।

মেমের চিৎকারে মুখ তুলে বিজিত যখন দেখল, তখন মেম একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে গেছেন।

সাহেবও সাহায্যের জন্য দ্রুতপায়ে নামছিলেন, কিন্তু তার আগেই বিজিত পৌঁছে গিয়েছিল।

হাত ধরে মেমকে তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাডাম, চোট কি বেশী লেগেছে?'

মেম গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'না ধন্যবাদ। ছেড়ে দিন।' অপ্রস্তুত বিজিত ছেড়ে দিল।

ততক্ষণে সাহেব এসে গিয়েছেন।

মেমের কোমর ধরে সস্নেহে বললেন, 'ডার্লিং, চলতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ পারব। ঘাসের ওপর পড়েছি। আমার মোটেই লাগে নি।'

দুজনে নেমে গেলেন।

বিজিত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সে কি ভুল দেখল? তা কি সম্ভব?

ঘন সন্নিবদ্ধ পাতার জন্য এখানে রোদ কম। কাজেই খুব আলো নেই। কিন্তু এত কাছ থেকে বিজিত মানুষ চিনতে পারবে না, তা কি হয়।

হোটেলে ফিরে বিজিত বলে ফেলল। এমন একটা ব্যাপার চেপে রাখতে পারল না।

বাবা আর মা মুখোমুখি বসেছিলেন। বেতের চেয়ারে।

বিজিত সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

মা হাসলেন, 'হ্যাঁরে বিজিত, তুই কি দার্জিলিং একেবারে গাছশূন্য করে যাবি। রোজই তো গাদা গাদা গাছ উপড়ে আনছিস।'

বিজিত মুচকি হাসল, তারপর বলল, 'আজ একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল মা।'

'কার সঙ্গে রে? তোর কলেজের বন্ধু।'

'না মা', বিজিত মাথা নাড়ল, 'কণিকে দেখলাম।'

মা আর বাবা দুজনেই চমকে মুখ তুললেন।

বাবা কিছু বললেন না। মা বললেন, 'কণি? কোথায়?'

'বটানিক্যাল গার্ডেনে।'

বিজিত আশা করেছিল তার মা কিংবা বাবা আরো কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু না, তাঁরা চুপ করে গেলেন।

অথচ কণির সম্বন্ধে কোন কথাই যে বিজিতের বলা হ'ল না।

একজন সাহেবের সঙ্গে নামছিল, হঠাৎ পাথরে ঠোকর লেগে পড়ে গেল।

'পরনে স্কার্ট, বড় চুল, তবু আমি চিনতে পারলাম, কিন্তু কণি আমাকে চিনতে পেরেছে এমন মনে হ'ল না।'

'কণি মেমের পোশাকে?'

বিজিতের মা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

বিজিতের বাবা এবারেও কোন কথা বললেন না কণি মায়ের আশ্রয় থেকে চলে এসেছে, এ খবর কি তাঁর জানা! না কি, মানুষের জীবনের রহস্য, বৈচিত্র্য, উন্নতি অবনতি এসব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আছে। থাকা স্বাভাবিক।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বিজিত বলল।

'হ্যাঁ, একেবারে পুরো মেমের পোশাক। মনে হ'ল সাহেবের সঙ্গেই যেন বিয়ে হয়েছে।'

মা আর কিছু বললেন না। গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মনে হ'ল, এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ নিয়ে বিজিতের সামনে কোন আলোচনা করতে তিনি প্রস্তুত নন।

একটু দাঁড়িয়ে বিজিত ভিতরে ঢুকে গেল।

সারাদিন খুব মনোরম। সন্ধ্যা হ'লেই ঠাণ্ডা শুরু হয়। গরম আলোয়ান ছাড়া চলে না।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বিজিত ভাবে—কণির সম্বন্ধে শেষ সংবাদ সে শুনেছিল, কণি তার মায়ের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে চলে গেছে। নিজেদের জীবনযাত্রা সঙ্কুচিত করে কোন রকমে দিনযাপন।

কিন্তু কণি যে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি, তার প্রমাণ বিজিত আজই পেয়েছে।

কণি কি এই সাহেবকে বিয়ে করেছে? ডালিং সম্ভাষণ দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতার প্রতীক।

হয়তো বিয়ে করে নি।

কিন্তু কণি তাকে না চেনার ভান করল কেন!

কণির পুরানো জীবনের সঙ্গে বিজিতের পরিচয় আছে বলেই কি?

কণির পাশাপাশি শমিতার কথাও মনে এল।

কেন জানা নেই, বিজিত আশা করেছিল, শমিতা একদিন তাদের বাড়ি আসবে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

ছোট শহর দার্জিলিং।

এখানে স্বাস্থ্যান্বেষী মানুষ যাঁরা এসেছেন, সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হয়ে যায়। ম্যালে, জলাপাহাড়ে কিংবা যে কোন পথের বাঁকে।

তেমনই একদিন আবার দেখা হয়ে গেল।

ম্যাল থেকে নেমে স্টেপ এসাইড। ঠিক তার সামনাসামনি একটা বেঞ্চের ওপর।

দূর থেকে বিজিত দেখেছিল। তার দু' হাত বোঝাই গাছগাছড়া। ইচ্ছা করেই এ জায়গাটা বিজিত দ্রুতপায়ে পার হবার চেষ্টা করল। চেনাজানার পালা যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন জের টানার কোন মানে হয় না।

'বিজিতবাবু, বিজিতবাবু।'

আশ্চর্য হয়ে বিজিত পিছন ফিরল। কণি বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। কাছে নয়, বিজিত শুধু কয়েক পা এগোল।

'আপনি কবে এসেছেন?'

রীতিমত গম্ভীরকণ্ঠে বিজিত উত্তর দিল, 'এই কয়েক দিন।'

'একলা?'

'না, বাবা মা-ও এসেছেন।'

কণি বিজিতের নিঃস্তাপ ভঙ্গী লক্ষ্য করেই তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমার ব্যপারে বোধ হয় আপনি একটু আশ্চর্য হয়েছেন।'

বিজিত ভাল করে কণিকে দেখল। ফুলের নক্সা আঁকা গোলাপী স্কার্ট। তার ওপর সবুজ রংয়ের পাতলা জাম্পার। দু' কানে বড় বড় রিং। গলায় পাথরের মালা। বোঝা যায় এখান থেকেই কেনা। মালার লকেট হিসাবে একটা ক্রশ ঝুলছে।

খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, 'অন্যের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল কম।'

বিজিতের কথায় কান না দিয়ে কণি বলতে লাগল, 'গ্রামে হাঁপিয়ে উঠলাম। বিশেষ করে গ্রামের লোকেরা আমায় সহ্য করতে পারল না। আমার পুরানো জীবন নিয়ে পথে-ঘাটে কুৎসিত আলোচনা। এক রাতে কলকাতায় পালিয়ে এলাম। আগের বন্ধুদের দরজায় বৃথাই ঘুরে বেড়ালাম। কেউ পাত্তা দিল না। দু' একজন আমার দেহ সম্বন্ধে খুব আগ্রহী হয়ে উঠল। গ্রামে ফিরে যাব কিনা যখন ভাবছি, জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জন ক্লায়েন। মিশনারী স্কুলের শিক্ষক। আমেরিকা থেকে এসেছে। সব শুনে আমায় বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর মাস দুয়েক এখানকার মিশনারী স্কুলে বদলি হয়ে এসেছে। আমরা বিয়ে করেছি আমাকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়েছে। তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই। কি দিয়েছে আমাকে হিন্দুধর্ম!'

কথাগুলো বলে উত্তেজনায় কণি হাঁপাতে লাগল।

উত্তরে কি বলা যেতে পারে বিজিত ভাবতে লাগল, কিন্তু ততক্ষণে কণি পাহাড়ী রাস্তা ধরে ম্যালের দিকে এগিয়ে গেছে। বোধ হয় নিজের কথাই কণি বলতে এসেছিল। তার, সম্বন্ধে কে কি ভাবল তার জন্য তার কোন চিন্তা নেই। বিজিত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনে মানুষের বাঁচাটাই সব চেয়ে বড় কথা। কিভাবে, কেমন

করে সে বাঁচল, সেটা কিছু নয়। মানুষের সৎ অসৎ হওয়া নির্ভর করে সুযোগের ওপর। কণি উচ্ছৃঙ্খল হবার সুযোগ পেয়েছিল। তার জীবনযাত্রার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবার অবকাশ ছিল। এর জন্য তার পারিবারিক পরিবেশ যতটা দায়ী, সে ততটা নয়।

বিজিত ঠিক করে ফেলল, কণির কথা মা-বাবাকে কিছু বলবে না। হয়তো বাবা কিছু শুনেছেন। তার ভাবভঙ্গী দেখে তাই মনে হ'ল। মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ।

বাংলাদেশের এমন হাজার হাজার পথভ্রষ্ট মেয়ে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তবু তো কণি আশ্রয় পেয়েছে। অবশ্য নিরাপদ আশ্রয় কিনা কে জানে।

কণির সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

এর মধ্যে বিজিত বার দুয়েক বটানিক্যাল গার্ডেনে গেছে: উদ্ভিদের খোঁজে না কণিকে দেখবার আশায় নিজেই জানে না।

তারপর একদিন কলকাতায় নেমে এল।

বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু বিজিতের মনে হ'ল বাবার শরীরের বিশেষ উন্নতি হয় নি।

একটু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দার্জিলিং-এ থাকতে মাঝে মাঝে চেয়ারে বসে দূরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন। কয়েকবার ডাকলে তবে সাড়া পাওয়া যেত।

কলকাতায় ফেরার একমাসের মধ্যে বিজিতের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল।

অভাবনীয়। এমন যে হবে বিজিত নিজেও কল্পনা করে নি একবার ভাবল বাবাকে অফিসে ফোন করে খবরটা জানাবে: মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে ফোন করা যেতে পারে।

কিন্তু বিজিত লজ্জায় কিছু করল না।

বিকেলে বাবা অনেক আগেই ফিরলেন। অফিসের মোটরে নয়, ট্যাক্সিতে। বিজিত বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখে সহাস্যে বললেন, 'কংগ্র্যাচুলেশন। আমি খুব খুশী হয়েছি।'

বোঝা গেল, বাবা খবরটা আগেই পেয়েছেন।

'এবার কি করবে বল?'

বিজিত হেসে বলল, 'আমি কি বলব।'

'সেকি, তোমার অন্তরের ইচ্ছা নেই একটা। এখন তো বড় হয়েছ, নিজের পথ নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।'

মৃদুকণ্ঠে বিজিত বলল, 'আমি এম, এস-সি পড়ব।'

'বেশ তারপর।'

'রিসার্চ।'

বাবা আর কিছু বললেন না। একটু হাসলেন শুধু।

বাবার গলার স্বর পেয়ে মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন.

তিনি বললেন, 'তুমি যে এত আগে চলে এলে। শরীর ভাল আছে তো?'

বাবা শরীরের কথা বাদ দিয়ে বললেন, 'তোমার ছেলে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছে, সেই আনন্দে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।'

বিজিতের হঠাৎ কি মনে হ'ল। এগিয়ে গিয়ে প্রথমে বাবাকে তারপর মাকে নীচু হয়ে প্রণা করল

বাবা কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মা বললেন, 'সত্যিকারের মানুষ হও।'

সেই রাত্রেই।

রাত তখন ঠিক কত, বিজিতের খেয়াল নেই.

হঠাৎ মায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'বিজিত, বিজিত।'

ধড়মড় করে বিজিত উঠে বসল। খাটের পাশে মা। বিস্রস্ত পোশাক, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

'শিগ্‌গির ওঠ বাবা। বড় বিপদ।'

'বিপদ? কি হয়েছে মা?'

ঘুমচোখে বিজিত যেন কিছু বুঝতে পারল না।

মা আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

পিছন পিছন বিজিত এল।

বাবার ঘরে জোরালো বাতি। তারকের মা এককোণে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। দুটো হাত বুকের ওপর। গলার মধ্য থেকে অদ্ভুত এক ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে।

মায়ের আকুল কণ্ঠ. 'বিজিত, ছুটে যা বাবা, ডাক্তারকে খবর দে।'

বিজিত রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াতে তার খেয়াল হ'ল, পরনে গেঞ্জী আর পা-জামা। খালি পা। নিজের ঘরে গিয়ে পায়ে চটি গলিয়ে আসবারও সুযোগ পায় নি।

ডাক্তার সোম প্রয়োজনে তিনিই আসেন। বিজিত তাঁর বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল টিপল অনেকক্ষণ কোন সাড়া নেই। তারপর কুকুরের ডাক ভেসে এল। ডাক্তারের অ্যালসেসিয়ান।

বেশ কিছু পরে দরজা খুলল। নেপালী চাকর চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার সাব।

নেপালী ভিতরে চলে যেতে বিজিত একটা চেয়ারে বসে পড়ল। দুটো পা-ই অসম্ভব কাঁপছে। গলার কাছটা শুকিয়ে উঠছে। একটু জল পেলে হ'ত। বিজিতের মনে হল যেন অনন্তকাল। নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল।

এক সময়ে সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ।

ব্যাগ হাতে ডাক্তার সোম এসে দাঁড়ালেন।

'কি খবর?'

'বাবার শরীর খুব খারাপ হয়েছে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন।'

ডাক্তার সোম গ্যারেজ থেকে মোটর বের করলেন। বিজিত তাঁর পাশে উঠে বসল। মিনিট দশেকের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গেল।

সমস্ত বাড়িটা আশ্চর্য রকমের স্তব্ধ। নীচে, ওপরে আলো জ্বলছে। একতলায় তারকের মা দাঁড়িয়ে—দরজা খুলে।

দ্রুত পায়ে বিজিত ওপরে উঠে গেল। পিছন পিছন ডাক্তার সোম। মা বাবার মাথার কাছে বসে আছেন।

গলার যে শব্দটা বিজিত যাবার সময় শুনেছিল, সেটা আর নেই।

ডাক্তার সোম ঢুকতে মা উঠে দাঁড়ালেন।

মিনিট পাঁচেক, তার বেশী নয়। ডাক্তার সোম নিবিষ্টচিত্তে নাড়ী দেখলেন। স্টেথস্কোপ বুকে বসিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একবার বিজিতের মায়ের দিকে, আর একবার বিজিতের দিকে দেখলেন, তারপর খুব আস্তে, প্রায় স্বগতোক্তির মতন বললেন, 'করোনারি। আর কিছু করার নেই।'

সমস্ত ঘটনা, তার তাৎপর্য বুঝতে বিজিতের বেশ সময় নিল। মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এই তার প্রথম।

বিজিতের মা খুব শান্ত। শুধু আঁচল দিয়ে দুটো চোখ চাপা দিয়েছেন। বিজিত ভেবেছিল, মা হয়তো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করবেন। আশপাশের লোকেরা ছুটে আসবে।

না, সে রকম কিছু হল না। শোকের একটা শান্ত, সংহত রূপ আছে। সে বিষাদ, মৌন, গম্ভীর।

ডাক্তার সোম নিজের ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে চেয়ারে বসে বসে খসখস করে কি লিখলেন। লেখা শেষ হতে কাগজটা বিজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডেথ সার্টিফিকেট।'

মন্ত্রচালিতের মতন বিজিত কাগজটা নিল।

ডাক্তার সোমের পিছনে এগিয়ে যেতে গিয়েই বিজিত থেমে গেল। মা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। হাতে কয়েকটা নোট। বিজিত নোটগুলো নিয়ে নেমে এল।

বাইরে, মোটরের কাছে এসে বিজিত টাকাটা ডাক্তার সোমকে দিল।

এত তাড়াতাড়ির কি ছিল।

কথাটা বললেও ডাক্তার সোম টাকাটা পকেটে রাখলেন।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরা এসে জুটল। বোঝা গেল, তারকের মা-ই খবর দিয়েছে। বিজিতরা পাড়ার সকলেরই প্রিয় ছিল। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। শান্তিপ্রিয়।

একটু বেলায়, সাড়ে দশটা নাগাদ অফিসের মোটর এসে দাঁড়াল। বিজিতের বাবার সহকর্মী অফিসাররা এসেছেন। মালা, আর পুষ্পস্তবক নিয়ে। অনেকেই শ্মশান পর্যন্ত গেলেন।

সব কিছুই বিজিতের খুব আশ্চর্য মনে হল।

একটা মানুষ, পারিবারিক তৃপ্তি অতৃপ্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, মেধা, কামনা বাসনা সব কিছুর পরিণতি এক মুঠো চিতাভস্মে।

বিজিতের মনে পড়ে গেল, তার বাবার প্রথম উপার্জনের টাকা হাত পেতে নেবার আগেই পিতামহ চোখ বুজেছিলেন। বিজিতের বাবা তার আগেই চলে গেলেন, বিজিতের সাফল্যের খবরটুকু শুনেই।

তখনও বিজিতের বাবার চিতা জ্বলছে। বিজিত একটু দূরে একটা গাছের তলায় বসেছিল, তার বাবার সহকর্মীদের কাছে। নানা জনে নানা উপদেশ দিলেন।

একজন বললেন, 'তোমার এত ভাল কেরিয়ার, তুমি ইউ কে চলে যাও।'

আর একজন, 'আমাদের অফিসে একটা দরখাস্ত দিয়ে দাও। আমরা তো রয়েছি।'

আবার একজন বললেন, 'এই বয়সে সংসারের ভার তোমার ওপর পড়ল। অর্থকরী কিছু একটা করার চেষ্টা কর।'

বিজিত কিছু বলল না। কি করবে সে নিজেই জানে না। হয়তো এম, এস-সি পড়া হবে না। কণির মায়ের মতন নিজেদের গুটিয়ে নিতে হবে।

বাড়িটা নিজের সেইটুকুই সান্ত্বনা। অপরিসর পরিবেশে চলে যেতে হয়ত হবে না। এ বাড়িতেই থাকতে পারবে।

বাবার কাজ চুকতে মা আর ছেলে মুখোমুখি বসল।

এ বাড়িতে বাবার কোন ছবি ছিল না। মা নিজের স্যুটকেশ থেকে বিয়ের একটা ফটো বের করে দিয়েছিলেন। সেই ফটো থেকে বাবার ছবিটা বড় করানো হয়েছে। তরুণ বয়সের ছবি! চেহারায় বিজিতের সঙ্গে বেশ মিল।

সেই ফটোটা ওপরে বাবার শোবার ঘরে টাঙানো হয়েছে।

এই বিপদে বিজিত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। নিকট আত্মীয়-স্বজন তাদের বিশেষ নেই। বাঁকুড়া থেকে মেসোমশাইয়ের আসার কথা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি আসেন নি। তাঁর দুই ছেলে এসেছিল।

মা বললেন, 'বিজিত, এবার ?'

মায়ের কণ্ঠস্বরে বিজিত বেশ ভয় পেল। তার মনে হল, মা হয়তো চরম দুঃসংবাদ শোনাবেন। বলবেন, এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

না, অত নিদারুণ দুঃসংবাদ নয়, তবে তিনি সাবধান হবার কথাই বললেন।

'ভাবছি একতলাটা ভাড়া দিয়ে দেব। আমাদের দুজনের পক্ষে দু'-তলার তিন-চারখানা ঘরই যথেষ্ট।'

বিজিত কোন উত্তর দিল না। চুপ করে শুনল।

মা আবার বললেন, 'তোমার বাবা বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি। এখন বুঝতে পারছি, এ বাড়িটা করার জন্য অফিস থেকে ধার নিয়েছিলেন। অনেকদিন ধরে সে টাকা শোধ করতে হয়েছিল। নগদ বিশ হাজারের মতন হাতে পেয়েছি।'

বিশ হাজার টাকায় কতদিন চলতে পারে, কিভাবে, সে বিষয়ে বিজিতের কোন সাংসারিক জ্ঞান ছিল না। সে শুধু ভাবতে লাগল, এ-সব কথা তাকে জানাবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই, যে শিক্ষার জন্য বিদেশে যাবার আশা দুরাশা। সংসারকে কষ্ট দিয়ে এ শিক্ষাবিলাস সম্ভব নয়।

'আমি একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখব মা?'

মা ভ্রূ কোঁচকালেন। নতুন পোশাকে মাকে যেন অন্য রকম দেখাচ্ছে। বর্ণহীন এই আবরণে, আভরণহীন অবস্থায় কেমন যেন এক দীন অসহায় রূপ।

'না, না, যা তা চাকরির চেষ্টা তোমাকে করতে হবে না। তুমি তো জান, তোমার ওপর উনি কতটা আশা রাখতেন। তুমি তোমার উপযুক্ত কোন চাকরির খোঁজ কর।'

উপযুক্ত চাকরি! বিজিতের পক্ষে অধ্যাপকদের সুপারিশে হয়তো ছোটখাটো বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার কাজ জুটতে পারে। কিন্তু তাতে এমন কিছু সুরাহা হবে না। মাইনে খুব বেশী নয়, তাছাড়া শিক্ষাজগতে সঙ্কট চলেছে। ছাত্র-অধ্যাপকদের সম্পর্ক আজকাল তিক্ত।

বিজিত একদিন লক্ষ্য করল, বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে। একতলায় অদল বদল চলেছে। বাবা বেঁচে থাকতেই মিস্ত্রির ছুটকো কাজ মায়ের তত্ত্বাবধানেই হত। তারকের মাকে দিয়ে বস্তি থেকে মা মিস্ত্রি ডেকে আনাতেন। তাঁর নির্দেশেই কাজ হত।

বাড়ির কাজ শেষ। ভাড়াটেও এল। প্রৌঢ় প্রৌঢ়া। পাড়ার একজনের আত্মীয়। ভদ্রলোকের ছেলেরা একজন বম্বে, অন্যজন

এলাহাবাদ। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি রাঁচী। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার: তাদের গলার আওয়াজও বিশেষ পাওয়া যেত না।

বিজিত ভাবল, মায়ের কাজ তো মা সবই করলেন, এবার বিজিতের কাজ বিজিতকে করতে হবে। অর্থকরী একটা চাকরি। মাঝে মাঝে বিজিত কলেজে অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করত। তাঁর দুঃসংবাদের কথাও তাঁরা শুনেছিলেন।

খবরটা দিলেন অধ্যাপক সেন।

'বিজিত, তুমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দাও না। তোমার মতন ছেলের তো দেওয়া উচিত।'

অধ্যাপক সেন কাগজপত্রও দেখালেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নানারকমের পরীক্ষা। ভারতবর্ষের সেরা ছেলেরা এই সব পরীক্ষা দেয়। তাদের সঙ্গে কি বিজিত পেরে উঠবে।

'তুমি আই.এফ.এস পরীক্ষাটা দিয়ে দেখ না। বন-বিভাগের কাজ। বটানি তোমাকে খুব সাহায্য করবে। পরীক্ষক বোর্ডে আমি আছি।'

শুধু এই কথাই নয়, অধ্যাপক সেন পাঠ্য-তালিকাও জোগাড় করে দিলেন।

বিজিত ফেরার পথে গোটা কয়েক বই-ও কিনল।

তারপর আবার সাধনা শুরু।

বই কিনে নতুন করে পড়তে দেখে মা একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

বিজিতের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি কোন পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিস?'

'হ্যাঁ মা, অধ্যাপকরা আমাকে আই. এফ. এস-এর জন্য তৈরি হতে বলেছেন। বন-বিভাগের চাকরি।'

'চাকরি হলে তুই তো আর কলকাতায় থাকবি না।'

'না, মা, যেখানকার চার্জ দেবে, সেখানে চলে যেতে হবে। তবে কোন শহরে নয়, সরকারের সংরক্ষিত বনে।'

মা বিড়বিড় করে বললেন, 'ভালই হবে। এ শহর, এ বাড়ি আমারও ভাল লাগছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে, কিংবা বিক্রি করে চলে যাব।'

'দাঁড়াও মা, আগে চাকরিটা হোক। খুব শক্ত পরীক্ষা। ভারতবর্ষের বাছা বাছা ছেলেরা পরীক্ষায় বসে।'

'পরীক্ষা কবে?'

'এখনও মাস আষ্টেক বাকি।'

'মাস আষ্টেক!'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ বাড়ির আবহাওয়া মা যেন একেবারেই সহ্য করতে পারছেন না।

বিজিত লক্ষ্য করেছে ঘড়িতে ছটা বাজলেই মা উন্মনা হয়ে পড়েন। বারান্দায় এসে দাঁড়ান, ঘরমুখী জনতার দিকে চোখ রেখে। যে লোকটা আর কোনদিন ফিরবে না ফেরার কথা নয়, মা কি আশা করেন, হঠাৎ একদিন সে এসে কলিংবেল টিপবে। প্রত্যাশা করা অভ্যাস হয়ে গেলে, বুঝি এমনই হয়।

আগে মা ঠাকুরঘরে অনেকটা সময় কাটাতেন, এখন বেশী সময় খরচ করেন বাবার ফটোর সামনে। প্রতিদিন টাটকা মালা পরানো, ধূপ-ধুনো দেওয়া।

মাঝে মাঝে মায়ের অগোচরে বিজিতও গিয়ে ফটোর সামনে দাঁড়ায়। এ চেহারার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। এর মধ্যে সে রাশভারী, কর্মপ্রাণ মানুষটাকে খুঁজে পায় না।

সারাটা দিন পড়াশোনা করে বিজিত বিকালে বেরিয়ে পড়ে। আগে বাড়ির কাছের পার্কে বেড়াত, এখন আর ভাল লাগে না। পাড়ার ছেলেরা সেখানে অড্ডা দেয়। প্রৌঢ় প্রতিবেশীরাও থাকেন। কি করছে বিজিত, কি পড়ছে এই সব বিরক্তকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

বিজিত ট্রামে কিংবা বাসে গঙ্গার ধারে চলে আসে।

এ জায়গাটা খুব ভাল লাগে। স্বদেশী বিদেশী জাহাজ, একগাদা ডিঙি নৌকা, মাঝি মাল্লাদের কলরব আর মাঝে মাঝে ঘোলাটে জলের আবর্ত। ওপারে কলকারখানায় কালো কালো চিমনির পিছনে আকাশে রং ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যায়। সেই রঙের ছটা গাছপালায়, মানুষের দেহেও ছড়িয়ে পড়ে। শুধু কি দেহে, মনও হয়তো তার স্পর্শ লাগে।

অনেকক্ষণ ধরে বিজিত বেড়ায়। বেড়াতে বেড়াতেই চোখে পড়ে কূজনরত প্রেমিক-প্রেমিকা। পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন।

জেটির একেবারে কোণে, জলের ধারে একটি তরুণী। প্রথমে বিজিত লক্ষ্য করে নি। তার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। দৃষ্টি অন্যদিকে। পিছনে মোটরের তীব্র একটা হর্ণ সেই সঙ্গে অনেকগুলো মেয়ের সম্মিলিত হাসির শব্দ শুনে, তরুণী চমকে ফিরতেই বিজিত দেখতে পেল। তরুণী সম্ভবত তাকে দেখে নি, কারণ একটু পরেই সে মুখ ঘুরিয়ে আবার জলের দিকে দেখছিল।

বিজিত কয়েক পা এগিয়ে এল। মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'শমিতা দেবী!'

আহ্বান শমিতার কানে গেল না।

এবার বিজিত আরো একটু জোরে ডাকল নাম ধরে। শমিতা একেবারে উঠে দাঁড়াল। বিজিতকে দেখে বলল, 'আরে আপনি। চেহারা যেন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

বিজিত ম্লান হাসল।

শমিতা বলল, 'যদি তাড়া না থাকে তো বসুন।' বিজিতের তাড়া নেই।

পকেট থেকে রুমাল বের করে পেতে সে বসল।

বাতাস বইছে। বাতাসে শমিতার আঁচল উড়ে এসে বিজিতের কোলের ওপর পড়ল। শমিতা আঁচল সরাবার কোন চেষ্টা করল না। নিজের চিন্তায় যেন বিভোর। এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে বিজিতের অস্বস্তি বোধ হল।

সে প্রশ্ন করল, 'আপনি এখন কোথায় আছেন ?'

'দিদি এখন হাওড়ায় থাকে। আমি তার কাছেই আছি। আপনার চেহারা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?'

পিতৃবিয়োগের সংবাদ বিজিত দিল।

শমিতা অনেকক্ষণ বিজিতকে দেখল। এভাবে নিষ্পলক চোখে কেউ দেখলে অস্বস্তি লাগে। সেই অস্বস্তি কাটাবার জন্য বিজিত বলল, 'জানেন, মা অনেকদিন ধরে ভেবেছিলেন আপনি একদিন আসবেন। কালীঘাটে আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে মা আপনার প্রতীক্ষা করতেন।'

শমিতা চোখ ফিরিয়ে ঢেউয়ের ওপর রাখল। ধীরগলায় বলল, 'কতদিন যে ভেবেছি আপনার মা'র কাছে যাব, কিন্তু সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি।'

'মার কাছে যাবেন, তাতে সাহসের কি দরকার ?'

'আপনি বুঝবেন না। আমার মতন মেয়ের আপনার মায়ের কাছে যেতে হলে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়।'

কথাটা বিজিত ঠিক বুঝতে পারল না।

'বেশ তো, আমার সঙ্গেই একদিন চলুন।'

'না, না,' শমিতা শিউরে উঠল, 'আর যেতে পারব না। এ পোশাকে আর—'

লঞ্চের বাঁশীর শব্দে শমিতার বাকি কথা চাপা পড়ে গেল।

পরিবেশ কাটতে বেশ একটু সময় নিল। সত্যি একটা মানুষের মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দীনতার প্রতিচ্ছায়া আর একটা মানুষের ওপরও এসে পড়ে। রিক্ততার ছাপ। এ বিষয়ে বিজিতও ভেবেছে। এদেশে অনেক বিধবা অলঙ্কার পরে, কিন্তু বিজিতের মা নির্মম হাতে শেষ স্বর্ণচিহ্নটুকু অপসারিত করেছেন। পাড়ওয়ালা শাড়ী নয়, অঙ্গে থান জড়িয়েছেন। জীবন থেকে রং চলে যাবার সঙ্গে বেশবাস থেকেও রংকে নির্বাসন দিয়েছেন।

শমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রোজ এখানে আসেন ?'

শমিতার কণ্ঠস্বর অনেক সহজ। মনে হল শোকের আচ্ছন্নতা সে কাটিয়ে উঠেছে।

আমি দিনকতক ধরে রোজই আসছি।

কি আশ্চর্য, আপনাকে তো দেখতে পাই না। অবশ্য আমি রোজ এখানে বসি না। কোন কোন দিন নৌকাব ওপর বসে থাকি।

'নৌকার ওপর ?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল লাগে। মায়ের স্নেহ তো কোনদিন পাই নি। ঠিক মনে হয়, মায়ের কোলে দোল খাচ্ছি।'

শমিতার মনে কোথায় একটা আক্ষেপ আছে।

'আপনি বোধ হয় কলেজে পড়ছেন ?'

'না, কলেজের পাঠ শেষ হয়ে গেছে। এখন চাকরি খুঁজছি।'

শমিতা হাসল।

'খুঁজছেন যখন, আমার জন্যও একটা খুঁজবেন।'

'আপনার জন্য ? আপনি গান শিখছেন না ?'

'গান গেয়ে সংসার চালাতে পারব এমন অবস্থা নয়।'

বহুদিনের পুরানো ক া বিজিতেব মনে পড়ে গেল।

'আপনার দিদি তো উপার্জন করেন ?'

'করতেন। এখন অসুস্থ।'

'অসুস্থ ?'

'হ্যাঁ, গলায় ক্যান্সার।'

'হাসপাতালে দেন নি কেন ?'

'আপনি দিন না ব্যবস্থা করে। এদেশে হাসপাতালে বেড পাওয়া সহজ নয়। সারাটা দিন চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকি। দিদির যন্ত্রণা দেখি। বিকালের দিকে আর পারি না। পালিয়ে এই হাওয়ায় এসে বসি।'

'আপনার দিদি একলা থাকেন ?'

'না, ক্লাবের একজন কারখানা থেকে ফিরে আসেন। তখন আমি বের হই।'

বিজিত হাঁটুর ওপর মুখ রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। চারদিকে অন্ধকার নামছে। আকাশে রঙের ছটা আর নেই। একমুঠো নক্ষত্র এখানে ওখানে ছড়ানো। মাঝিরা সুর করে নামাজ পড়ছে।

বিজিত উঠে দাঁড়াল।

'চলুন, যাবেন না ?'

শমিতাও উঠল। 'হ্যাঁ যাব। কিন্তু আমি তো নৌকায় ফিরব।'

শমিতা জেটির পাশ দিয়ে সাবধানে নেমে গেল। তীরে বাঁধা একটা নৌকার ওপর গিয়ে বসল।

বিজিত চেঁচিয়ে বলল, 'কাল এখানে থাকবেন। কথা আছে।'

শমিতা মুখ তুলল। নক্ষত্রের আলোয় অস্পষ্ট দেখাল তার মুখের রেখা।

বাতাসে শব্দ ভেসে এল।

'থাকব।'

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিজিত ফিরে দেখল। নৌকা মাঝ গঙ্গায়।

বিজিত সোজা বাড়ি ফিরল না। শমিতার পাশে যখন বসেছিল, তখনই কথাটা তার মনে এসেছিল। তার সতীর্থ সুকুমার। তারও উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স ছিল। সেও ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে এম. এস. সি. পড়ছে। সুকুমারের বাবা মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক। নামের পিছনে বিদেশী ডিগ্রির মালা। সুকুমারের বাড়িতে বিজিত কয়েকবার গিয়েছে। তার বাবার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে শমিতার দিদিকে নিশ্চয় ক্যান্সার

হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলতে হবে।

ভাগ্য ভাল বিজিতের। সুকুমার বাড়িতে ছিল। তার বাবাও। ব্যস্ত লোক। প্রায় রোজ সন্ধ্যায় চেম্বারে থাকেন কনসাল্টেশনের জন্য।

সুকুমার বিজিতকে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল।

সুকুমারের বাবা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা জার্নাল পড়ছিলেন। বিজিতকে দেখে উঠে বসে বললেন, 'আমি খবরটা শুনেছি বিজিত। ভেরি স্যাড। তোমার আর ভাইবোন নেই?'

বিজিত মাথা নাড়ল। 'না।'

'তুমি কি করবে ঠিক করেছ?'

'আই. এফ. এস-এ কমপিট করব।'

'আই. এফ. এস মানে ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস। ভাল, উন্নতির অনেক সুযোগ আছে।'

বিজিত বলে ফেলল, 'আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।'

সুকুমারের বাবা পাশের টেবিলের ওপর রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে বললেন, 'কি দরকার বল।'

'আমার পরিচিত একজন ক্যান্সারে ভুগছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে হবে।'

বিজিত আত্মীয়া বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, শমিতার পদবী সরকার, কাজেই রক্তের সম্পর্ক আছে বলা চলবে না।

'হাসপাতালে? ভর্তি করার আগে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার। রোগের অবস্থা, রোগীর বয়স সব কিছু জানতে হবে। কাগজপত্রগুলো আমাকে একবার দেখিও।'

'আমি কাল কিংবা পরশু আপনাকে সব দেখাব।'

'রোগী কি তোমার বন্ধু?'

বিজিত একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

রোগিণীকে যখন আনতেই হবে, তখন সত্য বলাই ঠিক।

তাই সে বলল, 'রোগী নয়, রোগিণী।'

'রোগিণী!'

সুকুমারের বাবা অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিজিতকে দেখলেন।

সে দৃষ্টির সামনে বিজিত সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

যুক্তিগ্রাহ্য একটা কৈফিয়ৎ না দিতে পারলে সুকুমারের বাবা কি ভাববেন।

বিজিত বলল, 'আমাদের খুব পরিচিত মহিলা। হাওড়ায় থাকেন।'

'ঠিক আছে, তুমি তাঁর কাগজপত্রগুলো নিয়ে এস।'

ঘাড় নেড়ে বিজিত বাইরে চলে এল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুকুমারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে বিজিত বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ির কাছে এসে বিজিত দেখল বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে।

ম্লান জ্যোৎস্না। মাকে খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে। স্বভাবতই মা উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠেছেন। তারকের মা দরজা খুলে দিল।

বিজিত যখন ওপরে উঠে এল, একেবারে মায়ের পিছনে, দেখল তখনও মা একদৃষ্টে রাস্তার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'মা।'

মা ফিরে দাঁড়ালেন। 'কিরে, কখন এলি?'

'এইমাত্র। তুমি তো রাস্তার দিকেই দেখছিলে। দেখতে পাও নি আমাকে?'

'না তো। তোর এত দেরী হল?'

বিজিত উত্তরটা ভেবেই এসেছিল। বলল, 'কলেজের এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল।'

মা আর কিছু বললেন না। রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

মা রাস্তার দিকে চোখ রেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্য জগতে। হয়তো হারিয়ে যাওয়া মানুষটার কথাই ভাবছিলেন।

অসত্য কথা বলতে বিজিতের ভাল লাগে না, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি! মাকে কি বলা যায় গঙ্গার ধারে শমিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কাছ থেকে তার দিদির অসুস্থতার খবর পেয়েছিল। আর সেই অসুস্থতার খবরে বিচলিত হয়ে বিজিত ছুটে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। তার চেয়ে, পরে যদি প্রয়োজন হয়, বিজিত মাকে সব কথা বলবে।

পরের দিন বিজিত একটু তাড়াতাড়িই বের হয়ে পড়ল। তখনও রোদের তেজ নেই, কিন্তু তাপ আছে।

জেটির সেই জায়গায় গিয়ে বিজিত দাঁড়াল।

না, শমিতা নেই। এখনও হয়তো তার আসার সময় হয় নি। রুমাল বিছিয়ে বিজিত বসল।

অনেক নৌকা এসে ঘাটে লাগল। লোক নামল, কিন্তু তার মধ্যে শমিতা নেই। চারপাশে অন্ধকার নামতে, জাহাজে নৌকায় আলো জ্বলে উঠতে বিজিত দাঁড়াল। শমিতার আসার সময় পার হয়ে গেছে। হয়তো তার দিদির অবস্থা অবনতির দিকে, কিংবা শমিতা আসতে চায় নি, তাই আসে নি। কিন্তু আজ দেখা হলে ভালই হত। রোগের বিবরণ ডাক্তারের রিপোর্ট শমিতা এনে দিতে পারত, সেগুলো নিয়ে বিজিত সুকুমারের বাবাকে দিয়ে আসত।

ক্যান্সার। বিদ্যুৎগতিতে রোগ ছড়ায় স্নায়ু, শিরা, মজ্জায়, মাংস কোষে। চিকিৎসকদের বিহ্বল করে দেয়। একদিন দেরী মানে, রোগকে বেশ প্রশ্রয় দেওয়া।

একদিন নয়, পর পর চারদিন।

বিজিত অপেক্ষা করে ফিরে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সন্দেহজনক। শমিতা হয়তো সত্য কথা

বলে নি শুরু থেকেই। বিজিতের মায়ের কাছে এক আস্তানার কথা বলেছিল। বিজিতকে বলল, দিদির সঙ্গে থাকার কথা। দিদিকে প্রয়োজনে বালী থেকে হাওড়ায় নিয়ে এল।

বিজিত নিজের ওপরই বিরক্ত হল। অত তাড়াতাড়ি সুকুমারের বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার তার কি দরকার ছিল। তাঁর কাছে তার না গেলে বিজিত সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা হবে? সুকুমারের সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হলেই বা বিজিত কি বলবে! হাওড়া ছোট জায়গা নয়। ঠিকানা না জানা থাকলে বিজিতের পক্ষে শমিতাদের খোঁজ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

চারদিন পর।

বিজিত আর জেটির দিকে গেল না। অন্যদিনের মতন গঙ্গার ধারে পায়চারি করতে লাগল। সন্ধ্যা নামছে। জোয়ার আসছে জলের বুকে উন্মাদনা। আকাশে মেঘ থাকার জন্যই বিশেষ লোক সমাগম হয় নি। বোধহয় অকাল বর্ষণের ভয়ে।

হঠাৎ বিজিত দেখল, ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে একটা নৌকা তীরে আসছে। আবছা আলো-আঁধারে দেখা গেল, পাটাতনের ওপর একটি তরুণী দাঁড়িয়ে। এলোমেলো বাতাসে তার চুল উড়ছে, আঁচলও। বিজিত দাঁড়িয়ে পড়ল। নৌকা ঘাটে লাগতেই তরুণী লাফিয়ে নামল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সব ভুলে বিজিত চিৎকার করে উঠল।

'শমিতা।'

জল সরে যাবার পর, অনেক কাদা জমেছে। শমিতাকে কাদা পার হয়ে উঠতে হবে। বিজিত একটা হাত বাড়িয়ে দিল। একটু দ্বিধা করে শমিতা হাতটা ধরল, তারপর ওপরে উঠে এল।

জেটির দিকে নয়, বিজিত আলো-অন্ধকার মাখা এক কোণে গিয়ে বসল। 'কদিন কি হয়েছিল? আমি প্রত্যেকদিন খোঁজ করে যাচ্ছি।'

শমিতা কোন উত্তর দিল না। বিজিতের অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে অবাক হয়ে শুধু চোখ তুলে দেখল।

'তোমার দিদিকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেছিলাম। ডাক্তারের রিপোর্ট দরকার। সেগুলো কালই নিয়ে আসবে।'

বিজিতের কথা শেষ হবার আগেই শমিতা বিজিতের কোলের ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অনেক আগে মধ্য প্রদেশের অরণ্যে কেয়া সেনের স্পর্শে দেহের কোষে কোষে যেমন উন্মাদনা জেগে উঠেছিল, রক্তের সমুদ্রে উত্তাল চেতনা, তেমনই ভাব জাগল সারা শরীরে।

বিজিত একটা হাত রাখল শমিতার পিঠের ওপর।

খুব শান্ত, সান্ত্বনা দেবার কণ্ঠে বিজিত বলল, 'কি হল? এমন করছ কেন?'

আস্তে আস্তে মুখ তুলে শমিতা বলল, 'দিদি। দিদির চিকিৎসা?' আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিজিত বুঝতে পারল। মৃত্যু কিভাবে আসে, কত আচম্বিতে, সে ধারণা তার হয়েছে।

শমিতার দিদি আর নেই। তার চিকিৎসার আর প্রয়োজন হবে না।

'কবে?'

এর বেশী আর কিছু বিজিত বলতে পারল না। বলা সম্ভব হল না। শমিতা তার বুকের ওপর মুখ রেখে এখনও কাঁদছে।

'দুদিন আগে।'

শমিতাকে বিজিতের কোন দিনই ভাল লাগে নি। যে কদিন দেখা হয়েছে তার ব্যবহার রূঢ়, কঠিন মনে হয়েছে। শমিতার প্রতি তার যে খুব মমত্ববোধ ছিল এমন নয়। কিন্তু শমিতার আজকের কান্না, এই বিহ্বল ভাব তার দিদির বিয়োগের চেয়েও নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করেই হয়তো বেশী।

পৃথিবী শমিতার মত মেয়ের পক্ষে কোনদিনই নিরাপদ নয়। তার কোন অভিভাবক নেই, কিন্তু যৌবন আছে। বাইরের শত্রুর চেয়েও শমিতার দেহই তার সবচেয়ে বড় শত্রু।

আবেগ প্রশমিত হতে শমিতা উঠে বসল। তখনও কিন্তু তার একটা হাত বিজিতের হাতে বাঁধা।

এক সময়ে বিজিত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় থাকবে?'

একটা হাত দিয়ে রুক্ষ চুলের রাশ সরিয়ে দিয়ে শমিতা উত্তর দিল, 'দুটো ঘর আমাদের ক্লাবের ভাড়া করা। একটায় রিহার্সাল হত, আর একটায় আমরা থাকতাম। থাকতে অবশ্য অসুবিধা হবে না, কিন্তু বেশীদিন এ পরিবেশে আমি থাকতে চাই না।'

'তুমিও কি অভিনয় করতে?'

'না।' শমিতা মাথা নাড়ল, 'আমি গান গাইতাম।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। এখানে বেশীক্ষণ বসা যাবে না, কিন্তু শমিতার মোহময়ী সান্নিধ্য থেকে সরে যেতেও বিজিতের ইচ্ছা করল না।

বিজিতের জীবনে শমিতা প্রথম নারী। হয়তো তার প্রথম প্রেম। কণিকে তার ভাল লাগেনি। নীলাকে কিছুটা, কিন্তু নীলা কাছে আসেনি। কাছে আসার কোন প্রতিশ্রুতিও দেয়নি।

শমিতাকে শুধু বিজিতেরই নয়, তার মায়েরও পছন্দ। একমাত্র শমিতার কথাই তিনি বারবার বলেছেন।

কিন্তু শমিতা আসবে বলেও কথা রাখেনি। এড়িয়ে গেছে। তার এড়িয়ে যাবার কারণও বিজিতের অজানা নয়। মায়ের কাছে গেলেই অনেক প্রশ্ন উঠত। বিশেষ করে তার দিদির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে। আগে বিজিত অতটা বুঝতে পারে নি, এখন বোঝে, এদেশে অনেক মেয়ে শখের দলে অভিনয় করে জীবিকা অর্জন করে। আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে অন্যায়, অশালীন কিছু নেই, কিন্তু তাদের ঘর থাকে, অভিভাবক থাকে, হয়তো শাসনের রজ্জুও থাকে। কিন্তু

শমিতার তেমন কেউ ছিল না। স্রোতের শ্যাওলার মতন সে ভেসে বেড়াত, ক্লাবের তরুণদের অনুগ্রহ-নির্ভর। সেই জীবনের কথা বলতে শমিতা গ্লানি বোধ করত।

বিজিত কোথা থেকে সাহস পেল, সে নিজেই জানে না।

গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'শমিতা।'

'বল।'

'তুমি মাস পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করতে পারবে না। তার মধ্যে আমি দাঁড়াবার মাটি পাব। তোমাকে গ্রহণ করার পথে কোন বাধা থাকবে না।'

শমিতা মুখ তুলে দেখল। বোধ হয় বিজিতের মুখ দেখতে চেয়েছিল। তাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়, তার চিহ্ন খুঁজতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে মুখটা দেখতে পেল না। তবু বলল, 'আমি চিরদিন তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

বৃষ্টি বাড়ছে। আর বসা সম্ভব হল না। দুজনে উঠে দাঁড়াল।

শমিতাকে নৌকার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বিজিত বলল, 'রোজ এখানে আসবে তো?'

'কিন্তু তোমার লেখাপড়া? পড়াশোনার কোন ক্ষতি হবে না?'

'না। আমি সারাটা দিন পড়ে তারপর বের হই। সামনের মাসে আমার পরীক্ষা। তুমি এস। রোজ তোমাকে দেখলে মনে জোর পাব।'

সে রাত্রে বিজিতের ঘুম এল না। এখনও তার ভবিষ্যত অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করে এত বড় একটা প্রতিশ্রুতি সে কি করে দিল!

এ প্রতিশ্রুতির আর একটা দিক তার মনেই পড়েনি। তারা ব্রাহ্মণ, শমিতারা কায়স্থ। এই অসবর্ণ বিয়েতে মা কি সায় দেবেন?

এমন হতে পারে—মা হয়তো বাধাই দেবেন না। বিজিতের

পছন্দের জন্য নয়, সংসারের জটিলতার মধ্যে নিজেকে আর জড়াতে চাইবেন না। বিজিত যদি সুখী হয়, হোক।

প্রত্যেক দিন সম্ভব হল না।

সপ্তাহে দু দিন তিন দিন শমিতা আসে। তার গানের রিহার্সাল থাকে। দলের অভিনয়।

স্পষ্ট বলেই ফেলে, 'তুমি আমাকে নাও বিজিত। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে বাচাও। আমার শুধু একটা ভয় হয় বিজিত।'

'কি ভয়?'

'আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি সুশিক্ষিত, মেধাবী। আর আমি কি বল? ম্যাট্রিকও পাশ নই।'

বিজিত সান্ত্বনা দিয়েছে। 'স্কুল-কলেজের পাঠই সব নয় শমিতা। ভাল-মন্দর মাপকাঠি মোটেই নয়। জীবনের অভিজ্ঞতার দাম অনেক।'

'তা সত্যি বিজিত। অভিজ্ঞতার হলাহল পান করে আমি নীলকণ্ঠী হয়েছি। শুধু নীলকণ্ঠী, বিষকন্যা নয়।'

মাঝে মাঝে বিজিতের মনে হয়েছে, কথাটা মাকে বলে রাখবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে না জানিয়ে, তাঁকে প্রস্তুত হবার অবকাশ দেবে। মায়ের অভিমান হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তবু বিজিতের সাহস হয়নি। মা হয়তো মনে করতে পারেন, বিজিত লেখাপড়া ছেড়ে এই সব নিয়েই মেতেছে।

পরীক্ষা হয়ে গেল।

বিজিত খুশী। তবে এবারে শুধু পাশ করলেই হবে না। প্রথম দশজনের মধ্যে হতে হবে। সারা ভারতবর্ষে নানা কেন্দ্রে এই পরীক্ষা হয়েছে। প্রতিযোগীর সংখ্যাও অনেক।

পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় শমিতা বলেছিল, 'তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। এ-সবে সম্ভবত বিশ্বাসই কর না।'

বিজিত হেসে বলেছিল, 'কি সবে ?'

আঁচল খুলে শমিতা ফুল আর বেলপাতা বের করেছিল।

'আমার পাড়ায় এক শিবমন্দির আছে। সবাই বলে জাগ্রত দেবতা। ভোরবেলা উঠে স্নান করে সেখান থেকে এই নির্মাল্য এনেছি। কাল পরীক্ষা দিতে যাবার সময় পকেটে নিয়ে যাবে।'

দু হাত পেতে বিজিত ফুল আর বেলপাতা নিয়েছে। সাবধানে পকেটে রাখতে রাখতে বলেছে, 'বিজ্ঞান এখনও পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করতে পারে নি। যতদিন না পারছে, ততদিন এ সব না মেনে উপায় নেই।'

পরীক্ষা দিতে যাবার দিন মাকে প্রণাম করতেই মা বললেন, 'তোমার বাবার ফটোতে প্রণাম করেছ বিজিত ?'

মায়ের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ।

'করেছি মা। স্নান করে এসেই করেছি।'

মা পুজার ফুল নিয়ে বিজিতের পকেটে রাখতে গিয়েই থেমে গেলেন। পকেটে কি সব রয়েছে।

'কিরে, পকেটে ?'

বিজিত সামলে নিল। 'ফুল আর বেলপাতা মা। গঙ্গার ধারে এক শিবমন্দির আছে। সেখান থেকে এনেছি।'

'থাক। থাক।'

মা তার ওপরই নিজের ঠাকুরঘরের ফুল রেখে দিলেন।

বিজিত দেখল দুজনের মঙ্গল প্রার্থনা এক সঙ্গে মিশে গেল. মায়ের আর শমিতার।

কথা ছিল, দু' মাসের মধ্যে ফল বের হবে।

শিক্ষা-বিভাগে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হল। ছাত্র অধ্যাপক দু' দলই

ক্ষেপে গেল। বাংলাদেশের স্ফুলিঙ্গ গোটা ভারতবর্ষে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

ছমাস পরে ফল জানা গেল।

বিজিত দ্বিতীয় হয়েছে।

ক'দিন শমিতা আসছে না। অবশ্য সে আসবে না বলেই গিয়েছিল। দলের সঙ্গে বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে ঘুরবে।

বিজিতের ইচ্ছা ছিল, সাফল্যের খবর প্রথমে তাকেই দেবে।

মায়ের সঙ্গে ইদানীং দেখাই হয় না। সমস্ত সংসারের ভার তারকের মায়ের ওপর দিয়ে মা নিজেকে পূজার ঘরে সরিয়ে নিয়েছেন। খুব ভোরে স্নান সেরে ঢোকেন, দশটার আগে বের হন না। তারপর চা পান করে শোবার ঘরে ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বসেন। খেতে আসেন দুটোয়। আবার পাঁচটা বাজতেই ঠাকুরঘরে। রাতের আরতি সেরে তবে নীচে নামেন। কেমন অন্যমনস্ক। বিজিতের সব কথা যেন ভাল করে শোনেনও না। একটু শুনেই বলেন, 'আমি আর কি বলব বাবা। তুমি যা ভাল বুঝবে, করবে।'

বিকালে বিজিত যখন ফিরল, তখন মা ঠাকুরঘরে। একটু অপেক্ষা করে বিজিত ওপরে উঠে গেল। ঠাকুরঘরের দরজায়।

দরজা বন্ধ। প্রথমে মনে হল, মা বিড় বিড় করে কি পড়ছেন, কিন্তু তারপর দরজায় কান দিয়ে বিজিতের মনে হল, মা যেন কাঁদছেন।

তাহলে পূজার নাম করে মা কি সকাল বিকাল এভাবে কাঁদেন।

'মা, ও মা।'

কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দ হল।

বোঝা গেল মা নিজেকে সংযত করেছেন।

'আমি পাশ করেছি মা। আজ খবর বেরিয়েছে।'

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। দুটো হাত সামনে প্রসারিত করে মা বিজিতকে বুকে টেনে নিলেন, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কয়েক মুহূর্ত, তারপর মা সরে দাঁড়ালেন। মৃদু কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'চাকরি কোথায় হবে?'

'এখনও পোস্টিং-এর কোন খবর পাইনি। শহরে তো রাখবে না, কোন জঙ্গলে পাঠাবে।'

বিজিতের কাঁধে একটা হাত রেখে মা বললেন, 'যা তোর বাবাকে খবরটা দিয়ে আয়।'

বিজিত নেমে এল। বাপের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা জানাল।

একটা পরীক্ষা শেষ। আর একটা পরীক্ষা বাকি। সে পরীক্ষা কঠিনতর।

দিন সাতেকের মধ্যে নিয়োগপত্র এসে গেল। ধলভূমগড়ের জঙ্গলে বিজিতকে যেতে হবে।

ধলভূমগড়, ঘাটশীলা, গালোধি, বিরাট এবং বিচিত্র অরণ্য সম্পদ। কাছেই নদী সুবর্ণরেখা। আদিবাসীরা জল ছেঁকে ছেঁকে সোনার সন্ধান করে। শাল, পিয়াল, মহুয়া, আমলকি, হরিতকীর গাছে ঘেরা নিবিড় অরণ্য। বিজিতের কাজ এ-সবের তদারকি। গাছকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করা, মুমূর্ষু গাছের সেবা, নতুন চারার পত্তন। বিজিত ঠিক করেছিল, নিজে একবার সরেজমিনে তদারক করে আসবে। বাংলোর অবস্থান, অন্য সুবিধা অসুবিধা। তারপর মাকে নিয়ে যাবে।

শুধু মাকে। এবার তো শমিতার সম্বন্ধেও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মায়ের সামনে কিভাবে কথাটা শুরু করবে, বিজিত ভেবে পায় না। মা একটু আহত হবেন, সন্দেহ নেই। বুঝতে পারবেন, এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ হয় না, হতে পারে না। অনেকদিন ধরে গোপনে গোপনে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চলছিল। সেই বিজিত যাকে মা বুকে করে মানুষ করেছেন, দু' হাত আড়াল করে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, সে-ও এমন একটা

লুকোচুরি খেলায় মাতল মাকে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে না দিয়ে।

এ-সব অসুবিধা স্বীকার করে নিয়েও শমিতার কথা মাকে জানাতে হবে। এছাড়া বিজিতের আর পথ নেই।

শমিতার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। বিজিত গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখল নির্দিষ্ট জায়গায় শমিতা দাঁড়িয়ে আছে।

'কবে ফিরলে?'

'কাল। তোমার কি হল?'

'ভালই, নিয়োগপত্র এসে গেছে। ধলভূমগড়ে পোস্টিং হয়েছে। এবার আসল কাজটা সেরে ফেলব।'

এদিক ওদিক দেখে শমিতা বিজিতের বুকের খুব কাছে সরে এল। 'আমার বড় ভয় করছে বিজিত। মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না আমরা সুখী হতে পারব না। তার চেয়ে তুমি অন্য কোন মেয়েকে জীবনে বরণ কর। তোমার যোগ্য কোন মেয়ে।'

'কেন তুমি বারবার এমন কথা বলছ শমিতা। তুমি তো জান এ হবার নয়। মানুষ জীবনে একবারই সত্যি ভালবাসে। জীবন নিয়ে জুয়া খেলা যায় না।'

শমিতা আর কিছু বলল না। মাথা নীচু করে রইল। একটা হাত বুলাতে লাগল বিজিতের হাতের ওপর।

বিজিত ধলভূমগড় থেকে ঘুরে এল। বনের মধ্যে বাংলো। একটা জীপ পাওয়া যাবে। এছাড়া কাজকর্ম করার লোক। মাসে একবার ডি. এফ. ও. তদারকে আসেন। তাঁকে একটু আপ্যায়ন করতে হয়।

সমাজ থেকে দূরে, লোকালয়বর্জিত জায়গা। এ ধরনের জায়গাই চিরদিন বিজিতের কাম্য। মাকে সব বিবরণ দিয়ে বিজিত বলল, 'এবার তাহলে যাবার আয়োজন কর মা। জিনিসপত্র

বাঁধাছাঁদার ব্যবস্থা। ছুতলাটাও ভাড়া দেওয়া হক। অবশ্য তুমি যা বলবে।'

বিজিতের খাটের ওপর বসে মা খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনার ভান করলেন, তারপর থেমে বললেন, 'আমি কোথায় যাব? এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তুমি যাবে না? আমি একলা যাব?'

'একলা কেন? এবার তুই একটা বিয়ে কর বিজিত। যদি নিজের কোন পছন্দসই মেয়ে থাকে তো বল, না হলে খুঁজতে হবে।'

বিজিত অনেকক্ষণ একদৃষ্টে মায়ের দিকে দেখল। মা কি কিছু টের পেয়েছেন?

কিন্তু এই তো সুযোগ। এমন সুযোগ বারবার আসবে না। তাছাড়া প্রসঙ্গটা আর চাপা দেওয়া অর্থহীন।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে মা।'

বিজিতের মনে হ'ল মা যেন একটু চমকে উঠলেন। কোন উত্তর দিলেন না। শুধু বিজিতের দিকে মুখটা ঘোরালেন।

'আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাই মা। সে মেয়েটিকে তুমি চেন।'

'আমি চিনি?'

'হ্যাঁ মা, আমি শমিতার কথা বলছি।'

'শমিতা! সেই যে বৃষ্টিতে ভিজে মেয়েটি—'

'হ্যাঁ, তারপর কালীঘাটেও দেখা হয়েছিল।'

'বিজিত পাদপূরণ করে দিল।'

'তোর সঙ্গে শমিতার দেখা হয় বুঝি?'

'আগে হয় নি মা, ইদানীং হয়েছে গঙ্গার ধারে, শমিতার দিদি কিছুদিন হল ক্যান্সারে মারা গেছেন। তবে একটা অসুবিধা হয়েছে।'

'কি অসুবিধা?'

'শমিতারা ব্রাহ্মণ নয়। আমাকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করতে হবে।'

মা উঠে দাঁড়ালেন। 'রেজিস্ট্রি বিয়েও তো আজকাল খুব হচ্ছে।' মেয়েটিকে কথা যদি দিয়ে থাকিস, আর তো কোন উপায় নেই। চলি, আমার পূজার সময় হয়ে গেল।'

সমস্ত ব্যাপারটা বিজিতের কাছে খুব আশ্চর্য মনে হল। কোন বাধা নয়, আপত্তি নয়। মনে হল বিজিতের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মায়ের কোন আগ্রহই নেই। হয়তো জীবন সম্বন্ধেই মা সব আশ্বাস হারিয়েছেন। জীবনের অনিত্যতা, অনিশ্চয়তা তাঁর নিজের কাছে অত্যন্ত প্রকট। মায়ের মতামতের বিষয়ে বিজিত কিছুই বুঝতে পারল না। শমিতার সম্বন্ধে মায়ের চিরকালই একটু দুর্বলতা, কিন্তু আজকের কথাবার্তায় সে দুর্বলতার কোন রেশ পাওয়া গেল না।

আবার কথা হল রাত্রে খাবার টেবিলে। ইদানীং মা রাত্রে শুধু দুধ খান। তবে বিজিতের খাবার সময় মাঝে মাঝে টেবিলে এসে বসেন।

তিনিই প্রথম বললেন, 'রেজিস্ট্রি বিয়েতে দিনক্ষণ দেখবার কি দরকার আছে?'

রেজিস্ট্রি বিয়ে সম্বন্ধে বিজিতের কোন ধারণা নেই। এইটুকু সে জানে, এ ধরনের বিয়েতে পুরোহিতের বদলে সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। আর দু পক্ষের দুজনেরই সাবালক-সাবালিকা হওয়া প্রয়োজন।

বিজিত কিছু বলার আগে মা-ই বললেন। 'তোকে কবে কাজে জয়েন করতে হবে?'

'দিন দশেক পরে।'

'তাহলে আর দেরী করিস না। বিয়েটা সেরে ফেল। শমিতাকে তো সঙ্গে নিয়ে যাবি?'

'তুমি তাহলে সত্যিই যাবে না?'

'বললাম তো, এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি ভেবেছিলাম অন্তত একবার গিয়ে তুমি সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে আসবে।'

মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বিজিত মাথা নীচু করে আহারে ব্যস্ত ছিল, তবু মনে হল মা তার দিকেই একদৃষ্টে দেখছেন। মা হয়তো দেখবার চেষ্টা করছেন, তাঁর জন্যে বিজিতের সত্যিই কতটা ব্যাকুলতা। বিজিত যখন ভাবল মা আর কিছু বলবেন না, তখন মায়ের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল।

'আজকালকার মেয়েরা খুব ভাল সংসার গোছাতে পারে। তোর কোন অসুবিধা হবে না।'

অনেকক্ষণ বিজিত মাথা তুলতে পারল না। যখন তুলল, তখন চেয়ার খালি। মা নেই।

রেজিস্ট্রি বিয়ের দিন ঠিক হল তিন দিনের পর।

সাক্ষী জোগাড় হল। নোটিশ দেবার একটা সময় আছে, কিন্তু বিজিতের বন্ধুর পরিচিত রেজিস্ট্রারের কল্যাণে সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হল না।

বিজিত ভেবেছিল বাঁকুড়ার মেসোমশাইকে খবরটা জানাবে, কিন্তু মায়ের নিস্পৃহ ভাব দেখে আর সাহস করল না।

ভোরবেলা স্নান সেরে বিজিত বাইরে আসতেই মায়ের সঙ্গে দেখা হল। মায়ের হাতে গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি। দুটোই নতুন।

'নাও পরে নাও।'

বিজিত নিজের ঘরে এসে ধুতি পাঞ্জাবি পরে নিল।

'বিজিত।'

'মা।'

'এ ঘরে এস।'

মা কেন ডেকেছেন বিজিত বুঝতে পারল।

সে বাবার ফটোর সামনে এসে দাঁড়াল। বাবার ফটোতে প্রণাম করে, মাকে প্রণাম করতে যেতেই মা তাকে বুকের মাঝখানে

টেনে নিলেন। চোখের জল আর বাধা মানল না। গাল বেয়ে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ল।

নীচে বন্ধুরা বসেছিল। তাদের একজনের মোটরও সঙ্গে ছিল। বিজিত মাকে প্রণাম সেরে দ্রুতপায়ে নেমে এল।

বিজিত বলেছিল, শমিতাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নেবে, কিন্তু শমিতা রাজী হয় নি।

বলেছে, 'সে গলি তুমি সারাজীবন খুঁজলেও পাবে না। তার চেয়ে আমি হাওড়ার পুলের সামনে অপেক্ষা করব।'

অনেক দূর থেকেই শমিতাকে দেখা গেল। পরনে আগুন-রঙা শাড়ী। খুব পারিপাটি করে বাঁধা খোঁপা। হাতে কলাপাতার ঠোঙা। শমিতাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। তার সারা মুখে তৃপ্তির ছাপ। শুধু দুটি চোখে যেন বিষাদের ছায়া।

মোটরের মধ্যে বসতে বোঝা গেল, তার হাতের কলাপাতার ঠোঙায় ফুলের মালা, ফুলের গহনা।

রেজিস্ট্রারের কাছে বেশী সময় নিল না।

তারপর সবাই মিলে এক হোটেলে ঢুকল। নিমন্ত্রণ-কর্তা সুকুমার। মোটরটাও তাদের। বিজিতের দুজন বন্ধুই শমিতার সাক্ষী হয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে, সকলে এক সিনেমায় গেল সাহেবপাড়ায় ইংরাজী বই। শো যখন শেষ হল, তখন পড়ন্ত রোদে অন্ধকারের মিশেল

বিজিত আর শমিতাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে বন্ধুরা বিদায় নিল।

বিজিত বাড়ির মধ্যে পা দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাড়া মাতিয়ে শাঁখের আওয়াজ। উলুধ্বনি।

এ-সব আয়োজন আবার কেন? কে এ-সব করছে। বাড়িতে সম্বল তো মাত্র দুজন। মা আর তারকের মা।

চৌকাঠে পা দিয়ে দেখল, নীচের ভাড়াটের স্ত্রী আর মেয়ে। একজনের মুখে শাঁখ, আর একজনের মুখে উলুরব।

ওপরে উঠে আরও বিস্মিত হল।

দেয়ালে ফুলের রিং। বিজিতের খাটে ফুলের গুচ্ছ।

ঠিক শোবার ঘরের দরজায় মা দাঁড়িয়ে, পরনে গরদের থান। গরদের ব্লাউজ। অপূর্ব মহিমময়ী মূর্তি।

শমিতা মুখ তুলে একবার দেখেই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মা। মা। মা।

বহুদিনের বাসনার পরিতৃপ্তি। মনে হল, নিজেকে নিংড়ে শমিতা মায়ের কাছে নিবেদন করছে।

মা-ও দু বাহু দিয়ে শমিতাকে আঁকড়ে ধরলেন।

তারপর এক সময়ে পাশে টিপয়ের ওপর রাখা ভেলভেটের কেসটা খুলে একটা হার নিয়ে শমিতার গলায় পরিয়ে দিলেন।

বিজিতের মনে হল, দুপুরবেলা মা হয়তো কাউকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ফুলের সজ্জা, নতুন হার সব কিনে এনেছেন।

যে ভয়টা বিজিতের মনের কোণে এতদিন আত্মগোপন করেছিল, ভেবেছিল এ ধরনের মেয়েতে মা সম্ভবত খুশী হবেন না, আজ মায়ের আচরণে সে ভয়ের ছায়া সরে গেল।

প্রথমে মা যা-ই ভেবে থাকুন, পরে হয়তো ভেবেছেন, বিজিত যদি সুখী হয় তাহলে তিনি বাধা হবেন না।

সুখের মূল্য অনেক, নিজের সুখ চলে যাবার পর, তিনি সেটা বুঝতে পেরেছেন।

শমিতাকে নিয়ে রওনা হল। যাবার আগে মাকে সঙ্গে আসবার জন্য আবার বলেছিল। শমিতাও অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল, কিন্তু মা অটল।

'তা হয় না শমিতা', মা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। যাওয়া সম্ভব নয়।'

এ এক নতুন রাজ্য। শাল, দেবদারু, মেহগণি, পিয়াল, হরিতকীর জটলা। হাজার পাখির কোলাহলে ভোর হয়। রাতের অন্ধকারে নানা জন্তুর চিৎকার ভেসে আসে।

শমিতা আর বিজিত দুজনেই শহরে মানুষ। এ পরিবেশে অভ্যস্ত নয়। শমিতা চমকে জেগে ওঠে। এই, কি ডাকছে শুনছ? বুনো কুকুরের ডাক।'

ঘুম ভেঙে বিজিত কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বলেছে, 'ও তো বার্কিং ডিয়ারের ডাক। ভয় নেই, হিংস্র জন্তু এ তল্লাটে নেই। শুনেছি মাঝে মাঝে বুনো হাতির দল এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে বাসা বদল করে, কিন্তু তারা কোন অনিষ্ট করে না।'

বাইরে বিশেষ অসুবিধা নেই। কাজকর্ম বিজিত অনেকটা রপ্ত করে নিয়েছে। বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিল অন্যত্র।

শমিতা মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে যায়।

বিজিত বাহুবন্ধনে শুধু শমিতার দেহটা পায়, তার মন নয়। বিজিত কাছে এলেই শমিতার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়, উদভ্রান্ত দু চোখের দৃষ্টি।

শঙ্কাকুল কণ্ঠে বলে, 'না, না, না।'

'কি না?' বিজিত প্রশ্ন করে।

'জান, আমার বড় ভয় করে। মনে হয়, এ সুখ, এত সুখ বোধ হয় আমার সহ্য হবে না।'

'ছি, ওসব কথা বলতে নেই।'

'মনকেও তাই বোঝাই, বলতে নেই। অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচবার জন্য তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সামাজিক বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে

এবারও তুমি তোমার বুকে আশ্রয় দিয়েছ, কিন্তু আমি কি এ বদান্যতার যোগ্য।'

'তোমার কি হয়েছে বল তো?' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বিজিত জিজ্ঞাসা করে।

'বলব, তোমাকে একদিন বলব। তোমাকে না বললে শান্তি পাব না।'

বিজিত শমিতাকে বুঝতে পারে না। শমিতা যখন দূরে ছিল তখন তার কাছে আসবার ব্যাকুলতা বুঝতে বিজিতের অসুবিধা হয় নি।

কিন্তু আজ কাছে এসে, প্রায় একাত্ম হয়েও এমন করছে কেন শমিতা!

অন্যদিকে তার কোন ত্রুটি নেই। যেদিন বিজিতকে দূরে যেতে হয়, সেদিন শমিতা খুব ভোরে উঠে পড়ে। মংলুকে ডেকে ওঠায়। যাবার আগে বিজিতকে খাইয়ে দেয়। সন্ধ্যার মুখে বিজিত যখন ফিরে আসে, তখন দুজনে বেতের চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসে।

—'তুমি ভীষণ একলা শমিতা। সারাটা দুপুর কথা বলবার একটি লোক নেই।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শমিতা উত্তর দেয়, 'আমি তো চিরদিনই একলা। আর আমার কষ্ট হয় না।'

হঠাৎ কথাটা বিজিতের মনে পড়ে যায়।

'তুমি আজকাল গান গাও না?'

'অনেক দিন গাই নি। ভয় করে।'

'ভয়? কিসের ভয়?'

'নকল হাসি কান্না আর নকল সংলাপ বলে বলে দিদির গলায় ক্যানসারই হয়ে গেল। মঞ্চে দিদিকে যারা বাহবা দিত, অসময়ে তারা কেউ এল না। তাই ভাবি, গান গেয়ে গেয়ে আমার গলায় যদি—'

'আ, কি বাজে বকছো।'

বিজিত বাধা দিল, তারপর এক সময়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'শোনাবে একটা গান?'

'শুধু গলায় গাইব?'

মাঝে মাঝে বিজিতের সঙ্গে শমিতাও যায়। বাহাদুর তখন মন্থর-গতিতে জীপ চালাল, যাতে দু'পাশের দৃশ্য দেখতে শমিতার অসুবিধা না হয়।

নাম-না-জানা পাহাড়ী ঝর্ণা। তার কূলে দুজনে বসে।

সবই ঠিক, কিন্তু বিজিতের মনে হয়, নিজের চারপাশে শমিতা যেন একটা রহস্যের বলয়ের সৃষ্টি করেছে। শমিতা আর বিজিত শুধু দুজন থাকলেই শমিতা গম্ভীর হয়ে যায়।

মধ্যে একবার ডি. এফ. ও সাহেব এসেছিলেন। তদারকি কাজে অবশ্য দিন দুয়েক আগে খবর পাঠিয়েছিলেন। জীপ নিয়ে বাহাদুর স্টেশনে গেল। সঙ্গে বিজিত। সমস্ত দিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি। গাছের হিসাব-নিকাশ। তারপর সন্ধ্যার সময় তিনি ফিরলেন। বিজিত শমিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ডি. এফ. ও সাহেবের। শমিতার পরনে শ্যাম্পেন রংয়ের শাড়ী। সেই রংয়ের ব্লাউজ। সাঁওতালী ঢংয়ে বাধা খোপায় সাদা চন্দ্রমল্লিকা।

গান শুনে ডি. এফ. ও সাহেব উচ্ছ্বসিত। বিজিত তোমার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি। আমার স্ত্রীর গলা আছে বটে, কিন্তু সে গলা শুধু বাড়িতে আগুন লাগলে দরকার হতে পারে। কথা শেষ করে ডি. এফ. ও নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন।

পরের দিন ভোরে ডি. এফ. ও চলে গেলেন।

তার দিন সাতেক পরেই নির্দেশ এল বিজিতকে কলকাতার অফিসে যাবার জন্য।

'শমিতা, চল কলকাতা ঘুরে আসি।'

শমিতা চা তৈরি করছিল। বিজিতের কথা কানে যেতেই হাত কেঁপে চায়ের কাপ মেঝের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বিজিত ছুটে তার পাশে এল। 'কি শরীর খারাপ নাকি?'

'না, না, শরীর ঠিক আছে।' শমিতা ভয়ার্তকণ্ঠে উত্তর দিল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, 'আমি কলকাতায় যাব না।'

'সেকি, তুমি তো এ জঙ্গলে হাঁপিয়ে উঠেছ।'

'এখানে শুধু হাঁপিয়ে উঠেছি, কলকাতায় গেলে দমবন্ধ হয়ে যাবে।'

বিজিত কিছু বলল না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শমিতাকে দেখল। কলকাতা শমিতাকে সুখ দেয় নি, শোক দিয়েছে, সেই জন্যই বুঝি কলকাতার প্রতি এই বিতৃষ্ণা। অবশ্য শমিতার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। লোকজন এখানে সবই আছে। মাত্র তিন দিন বিজিত থাকবে না।

বিজিতকে একলা দেখে তার মা একটু বিস্মিত হলেন।

'হ্যাঁরে, শমিতা আসে নি।'

'না মা, এই তিনদিনের জন্য আর তাকে আনলাম না। কিন্তু তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন? খাওয়া-দাওয়া করছ না ঠিকমত?'

মা মুচকি হাসলেন। 'তোর কি ধারণা আমি না খেয়ে আছি? রঘু রয়েছে, তাদের মা রয়েছে। আমাকে দেখাশোনা করার লোকের অভাব।'

বিজিত কিছু বলল না। দেহের কষ্টে মানুষ হয়তো কৃশ হয়, কিন্তু মনের কষ্টে আরও দ্রুত ক্ষীণ হবার সম্ভাবনা মায়ের মনে সুখ নেই। একটা মানুষের অভাবে মায়ের জীবন অন্ধকার।

এই তিনদিন বেশীর ভাগ সময় বিজিত মায়ের কাছেই রইল। সকালের দিকে বেরিয়ে অফিসের কাজ সেরে দুপুরের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে আসত।

মা শমিতার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। 'হ্যাঁরে, নতুন জায়গায় শমিতার ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ, ভালই লাগছে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। তুমিও চল, তোমারও ভাল লাগবে।'

মা হাসলেন। কোন উত্তর দিলেন না। বিজিত মাকে দেখল। মা অসুখী। তার জন্য কি বিজিত দায়ী? হয়তো ছেলের সুখের কথা ভেবে মা এই অসবর্ণ বিয়েতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের কোন রকম অনাগ্রহ বিজিত লক্ষ্য করে নি। এমন তো নয়, মায়ের ইচ্ছা ছিল, বিয়ের পর শমিতা কিছুদিন তাঁর কাছে থাকবে। কিন্তু বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল।

ভেবে বিজিত কোন কূলকিনারা পায় না। মায়ের একমাত্র সন্তান হবার অনেক অসুবিধা। বিয়ের পর সন্তান পর হয়ে যায় এমন একটা চিন্তা প্রায় সব মাকেই অতিষ্ঠ করে তোলে।

'হ্যাঁরে, তোর শরীর এমন হয়ে যাচ্ছে কেন?'

মায়ের প্রশ্নে বিজিত চমকে উঠল। 'আমার শরীর? কেন, আমি তো ঠিকই আছি। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাজ, একটু পরিশ্রম বেশী।'

মা আর কিছু বলেন নি। ট্রেনে ফিরতে বিজিত নিজেকে বার বার প্রশ্ন করেছে। সেকি সুখী। জীবনে যা চেয়েছিল, সব কি সে পেয়েছে। শমিতাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল কিন্তু শমিতা কি তার অন্তরের সব অভাব ঘোচাতে পেরেছে। শমিতা কাছে এসেও যেন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। বিজিত লক্ষ্য করেছে, জোর করে তাকে বুকের মধ্যে টেনে আনতে গেলেই, শমিতার শরীর শক্ত হয়ে যায়, চোখের তারায় ভয়ের ছায়া ফুটে ওঠে। নিজের সঙ্গে যেন সে যুদ্ধ করে।

ফিরে আসার দিন দশেক পর।

নিয়মমাফিক টহল দিতে দিতে বিজিত জঙ্গলের মাঝখানে থেমে

গেল। পাশে ছোট একটা ঝর্ণা। নানারঙের অজস্র নুড়ি বিছানো পথ। ঝর্ণার ওপারে ছোট টিলা। এ পারে পাথরের ওপর নিমগ্ন-চিত্ত একটি ভদ্রলোক। সামনে ইজেল। তার ওপর অর্ধসমাপ্ত একটি ছবি। ভদ্রলোক সেই মুহূর্তে আঁকছিলেন না। কি ভাবছিলেন। লঘুপায়ে এগিয়ে গিয়ে বিজিত লোকটির পিছনে দাঁড়াল।

টিলার পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সারা দিগন্ত জুড়ে আবিরের সমারোহ। বাস্তবে নয়, ইজেলের ওপর এই ছবি ফুটে উঠেছে।

'বাঃ।'

স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসার অব্যয় উচ্চারিত হতে চিত্রকর পিছন ফিরলেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, উজ্জ্বল দুটি চোখ, সুগৌর বর্ণ।

'আমার নাম দেবাশিস গুপ্ত। পেশায় আর্টিস্ট। মশাইয়ের পরিচয়।'

বিজিত হেসে নিজের নাম বলল। সঙ্গে যোগ করে দিল, 'আমি পেশায় অরণ্যরক্ষী।'

দেবাশিসবাবু কপট ভয়ে শিউরে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ, সংরক্ষিত অরণ্যে গাছকাটা নিষেধ জানতাম, ছবি আঁকাও বারণ নাকি?'

বিজিত কোন উত্তর দিল না। পাশের একটা পাথরের ওপর বসে বলল, 'ছবিটা শেষ করুন? সময় নষ্ট করবেন না।'

'আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।'

'কি সমস্যা?'

'ভেবেছিলাম টিলার নীচে কিছু পলাশ গাছ দেব, কিন্তু সূর্যের লাল ছটা আর পলাশের লাল রং মিশে যাবে। ঠিক এফেক্ট হবে না।'

বিজিত বলল, 'যে গাছই আঁকবেন অস্ত-সূর্যের আলোয় সবই তো লাল দেখাবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

দেবাশিসবাবু তুলি বোলাতে আরম্ভ করলেন। একটু পরে বিজিত উঠে দাঁড়াল।

'আপনি তো আছেন এখানে। আমি কাজগুলো সেরে আসি।'

'হুঁ, আছি। অন্ততঃ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আমার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।'

বিজিত চলে গেল। কাজ শেষ করে যখন ফিরল, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। সূর্য অস্তোন্মুখ। দেবাশিসবাবু নেই। এদিক ওদিক চোখ ফেরাতেই দেখা গেল একটা শালগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দেবাশিসবাবু বসে আছেন। মুখে পাইপ। ইজেল ক্যানভাসের ব্যাগে বন্দী।

'আপনার সূর্যাস্তের সমস্যা মিটল?'

বিজিতের প্রশ্নের উত্তরে দেবাশিসবাবু বললেন, 'তা মিটেছে কিন্তু আর এক সমস্যা হয়েছে।'

'কি?'

'আপনার এ জঙ্গলে বন্যজন্তু কেমন?'

'এ প্রশ্ন কেন?'

'ছবি আঁকতে আঁকতে খেয়াল ছিল না। এখন মনে পড়ল, শহরে যাবার শেষ ট্রেন পাঁচটা সতেরোয় ছেড়ে গেছে। সুতরাং বনে বাস ছাড়া উপায় নেই। শেয়াল, হরিণ হলে অসুবিধা নেই, ম্যানেজ করতে পারব, কিন্তু অ্যারিস্টোক্রাট ফ্যামিলির কেউ এলেই মুস্কিল। তারা চিত্রকরের বিশেষ খাতির করবে বলে মনে হয় না।'

বিজিত খুব জোরে হেসে উঠল। এভাবে অনেক দিন সে হাসে নি। হাসি থামিয়ে বলল, 'গরীবের ডেরায় আপনার হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবেন

আপনি কি একলা থাকেন?

না, সস্ত্রীক।

'তাহলে? আপনাদের সেই কূজন-মুখর পরিবেশের শুচিতা নষ্ট করা কি ঠিক হবে?'

'মা ভৈঃ। আমরা দুজনেই নতুন মুখের প্রত্যাশী। বুঝতেই পারছেন, এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে আছি, আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায়। কাজেই কেউ এলে আমরা খুশীই হই। নিন, উঠুন।'

দেবাশিসবাবু ইজেল, ক্যানভাস সব গুছিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বিজিতের পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করলেন।

'আপনি কলকাতায় কোথায় থাকেন?' নিতান্ত স্তব্ধতা ভাঙবার জন্য বিজিত প্রশ্ন করল।

'আমার থাকার কোন ঠিক নেই। যখন যেখানে ভাল লাগে, সেখানে থাকি।'

আর কোন কথা হল না। দূর থেকে বিজিত দেখল রোজকার মতন শমিতা বারান্দায় বসে আছে।

অন্যদিন শমিতা এগিয়ে আসে। স্বভাবতই নতুন লোক সঙ্গে দেখে শমিতা এগোল না। চুপচাপ বসে রইল। বিজিত কাছে গিয়ে ডাকল। 'এস শমিতা, তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই। ইনি দেবাশিস গুপ্ত। আর্টিস্ট।'

বাকিটা আমি পূরণ করে দিচ্ছি, দেবাশিসবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'জঙ্গল থেকে ধরে আনলাম।'

শমিতা হাসল না। দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করল।

তিনজনে বারান্দায় বসল। দেবাশিসবাবু কথা শোনেন কম, বলেন বেশী। অনর্গল কথা বললেন। বোঝা গেল, সম্পন্ন ঘরের সন্তান। ছবি আঁকাটা পেশার চেয়ে নেশাই বেশী। এইভাবে হঠাৎ কোথাও বেরিয়ে পড়েন। কয়েক দিন কাটিয়ে বাড়ি ফেরেন। তাঁর জন্য চিন্তা করবার মতন কেউ নেই। একটু পরে শমিতা উঠে গেল। বিজিত বাধা দিল না। বুঝতে পারল, অভ্যাগতের জন্য আয়োজন করা প্রয়োজন। লোকজন থাকা সত্বেও শমিতাকে থাকতে হবে।

বারান্দায় শুধু দেবাশিসবাবু আর বিজিত। পাইপ ধরাতে ধরাতে দেবাশিসবাবু বললেন, 'ভাল আছেন মশাই, খুব ভাল আছেন। মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ার অনেক ভাল। খিদে না পেলে কিংবা ভয় না পেলে জন্তুরা আক্রমণ করে না, কিন্তু মানুষ বিনা কারণে সর্বনাশ করে।'

বিজিত কোন উত্তর দিল না। তবে তার মনে হল, দেবাশিস-বাবু সম্ভবতঃ মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে থাকবেন।

বিজিত ভেবেছিল, রান্নার নির্দেশ দেবার পর শমিতা হয়তো বারান্দায় এসে বসবে। তখন বিজিত তাকে গান গাইতে বলবে। কিন্তু শমিতা এল না। পরিবর্তে মংলু এসে খবর দিল, খানা তৈরি।

দেবাশিসবাবুকে নিয়ে বিজিত খাবার টেবিলে বসল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও শমিতা এল না।

মংলুই বলল, 'মাইজির শরীরটা খারাপ হয়েছে। শুয়ে পড়েছেন।'

ইদানীং বিকালের দিকে শমিতার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। বিজিত লক্ষ্য করেছে, কথা বলতে বলতে শমিতা হঠাৎ থেমে যায়, কথা শুনতে শুনতেও উন্মনা হয়ে পড়ে। সর্বদা যেন কি চিন্তা করে। কিসের এত চিন্তা? দুজনে মন জানাজানির পর কাছে এসেছে। তবু শমিতার এ আচরণের কি হেতু!

পাশের একটা ঘরে দেবাশিসবাবুর শোবার আয়োজন হয়েছে। শুধু একটা রাত। তিনি ভোরের ট্রেনেই চলে যাবেন। বিজিত বাহাদুরকে বলে রেখেছে, জীপে দেবাশিসবাবুকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

দেবাশিসবাবুই বললেন, 'আপনি আর দেরী করবেন না বিজিতবাবু। মিসেসের যখন শরীর খারাপ।' একটু ইতস্ততঃ করে বিজিত উঠে গেল।

ঘর অন্ধকার। শমিতা শুয়ে পড়েছে। আলো জ্বালতে গিয়েও

কি ভেবে বিজিত জ্বালল না। আস্তে আস্তে বিছানার ওপর বসল। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে শমিতার কপাল স্পর্শ করে বলল, 'কি, শরীর খারাপ ?'

কোন উত্তর নেই। শমিতা বোধহয় ঘুমাচ্ছে। পোশাক ছেড়ে বিজিত শুয়ে পড়ল।

এখান থেকে কাছের শহর প্রায় মাইল সাতেক। ঠিক করল, শমিতাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে চলে যাবে। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করা দরকার। অবহেলা করলে হয়তো রোগ, যদি কোন রোগই হয়, অবনতির পথে যাবে।

বিজিত ভেবেছিল খুব ভোরে উঠবে। দেবাশিসবাবু যাবার আগে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু বিজিতের ঘুম ভাঙতে অনেক দেরী হয়ে গেল। মুখ হাত ধুয়ে দেবাশিসবাবুর ঘরে গিয়ে দেখল, তিনি নেই। চলে গেছেন। মংলুও বলল, নতুন সাহেবকে বাহাদুর খুব ভোরে নিয়ে গেছে।

শমিতা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাকে ডাকতে বিজিতের মায়া হল।

বিজিত ভাবল, শমিতাকে এতটা পথ না নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে এলে হয়। এখানে সময় নিয়ে ভাল করে দেখতে পারবেন।

ঘরের মধ্যে অপূর্ব সুরভি। দেবাশিসবাবুর জামাকাপড়ে বিজিত এই সুবাস পেয়েছিল. কোন বিদেশী সেণ্ট। উগ্র নয়, মদির সুরভি। বালিশটা তুলে নিয়ে বিজিত আঘ্রাণ করল, তারপর বালিশটা নামাতে গিয়েই থেমে গেল। নীল রংয়ের একটা কাগজ। তাতে কয়েক ছত্র লেখা। এ কাগজ বিজিতের। টেবিলের ওপর একটা প্যাড ছিল, কিন্তু কে লিখল এ কাগজে। কৌতূহলের বশে বিজিত কাগজটা তুলে নিল।

অল্প অল্প করে মুখে রক্তের সঞ্চার করে। বিজিত দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করল। মনকে বোঝাল,

অত অল্পে বিচলিত হওয়া অর্থহীন। এর চেয়ে কত তীব্র আঘাত আসে জীবনে। বিজিত নিজেকে সংযত করল।

চিঠিটা আবার পড়ল।

শমিতা,

তুমি যে তোমার অন্ধকার জীবন ছেড়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছ, এতে আমি আন্তরিকভাবে খুশী। আশা করি, তোমার স্বামীর কাছে তোমার ফেলে আসা জীবনের সব কথাই তুমি জানিয়েছ। মিথ্যা দিয়ে, গোপনতা দিয়ে যে জীবনের শুরু সে জীবন স্থায়ী হয় না,—সুখের হয় না।

তলায় কোন নাম নেই। হয়তো তার প্রয়োজনও নেই।

হঠাৎ বাইরে সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকারে বিজিত চমকে উঠল। চিঠিটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে ছুটে বের হয়ে এল।

জীপ ফিরে এসেছে। বাহাদুরের সঙ্গে জন তিনেক আদিবাসী কর্মচারী।

'সাহেব, গাছকাটার একটা বড় দল ধরা পড়েছে।' বিজিতের এখনই যাওয়া প্রয়োজন। বিজিত দ্রুত পোশাক বদলে জীপে উঠে পড়ল।

মাস দুয়েক হল কাঠের চোরা চালান চলেছে। রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে অন্ধকারে পাচার করছে। অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও কাউকে ধরা সম্ভব হয় নি। ব্যাপারটা ওপরওয়ালার কানেও উঠেছে। বিজিতকে আরো তৎপর হবার নির্দেশ এসেছে।

একেবারে অরণ্যের প্রান্তে। রক্ষীরা চারজনকে গাছের সঙ্গে বুনো লতা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আশে পাশে করাত আর কুড়ুল।

দু-ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলল। বোঝা গেল, এরা উপলক্ষ্য-মাত্র। পিছনে শক্তিশালী একটা দল আছে। তারা সর্বদেশে, সর্বকালে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তবু এরা যখন ধরা পড়েছে, তখন উপদ্রব হয়তো কিছুদিন বন্ধ থাকবে। এদের চারজনকে

থানায় নিয়ে যাওয়া হল। বিজিতকে বিবৃতি দিতে হল। তারপর বিজিত ওপরওয়ালার কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করল সব বিবরণ দিয়ে। লোক মারফৎ সে রিপোর্ট শহরে পাঠিয়ে, বিজিত যখন ফিরে এল, তখন উত্তপ্ত দুপুর।

গেটের কাছে মংলু দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন মুখে।

বিজিত বুঝতে পারল, তার ফিরতে দেরী হবার জন্য শামতা মংলুকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বিজিত কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আমার বড় দেরী হয়ে গেল রে মংলু। মাইজীও বোধ খায় নি এখনও?'

মংলু একবার বিজিতের দিকে দেখল তারপর মৃদুকণ্ঠে 'মাইজীকে পাওয়া যাচ্ছে না সাহেব।'

'পাওয়া যাচ্ছে না, সেকি? পিছনের বাগানে দেখেছিস

'হ্যাঁ সাহেব, সব দেখেছি ওই ডুংরি পর্যন্ত।'

বিজিত চঞ্চলপায়ে বাংলোর মধ্যে ঢুকল। শোবার ঘর, পিছনের বারান্দা, ড্রইংরুম, না কোথাও শমিতা নেই। দেবা. যে ঘরে শুয়েছিলেন, বিজিত সে ঘরে এসে দাঁড়াল। চিঠিটা দিয়ে গিয়েছিল টেবিলের ওপর। চিঠিটা নেই। ওদিক ও. চোখ ফেরাতেই দেখা গেল। চিঠি মেঝের ওপর। এলোমেলো বাতাসে একদিক থেকে আর একদিকে উড়ছে।

বিজিত নীচু হয়ে চিঠিটা কুড়িয়ে নিল। চিঠিটা হাতে করেই শিউরে উঠল। এমন তো নয় চিঠিটা শমিতার চোখে পড়েছে। তাড়াতাড়িতে চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে যাওয়াই বিজিতের ভুল হয়েছে।

'মংলু, মংলু।'

মংলু পিছনেই ছিল। 'সাহেব।'

'মাইজীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ সাহেব। মাইজী স্নান সেরে রান্নাঘরে এসেছিলেন। চা

বিস্কুট খেলেন। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। জানতে চাইলেন আপনি আর নতুন সাহেব এক সঙ্গে বেরিয়েছেন কিনা। তারপর ওদিকের ঘরে ঢুকলেন।'

'কোনদিকের ঘরে? যে ঘরে নতুন সাহেব শুয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সাহেব।'

তারপর।

'তারপর আমি সাইকেল নিয়ে হাটে চলে গেলাম। ফিরে এসে ার মাইজীকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বিজিত পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। দেবাশিসবাবু নিঃসন্দেহে ার পূর্ব পরিচিত। শুধু শমিতার সঙ্গেই নয়, অন্তরঙ্গভাবে তার নর সঙ্গেও। শমিতার জীবন সম্বন্ধে বিজিত কিছু জানে না। ার কৌতূহলও তার ছিল না। হয়তো অভাব অনটনের জন্য, শের চাপে তাকে অসামাজিক জীবন যাপন করতে হয়েছিল। ক্লদ, কিছু মালিন্য তার দেহ স্পর্শ করেছিল।

ন্তু বিজিত তার অপাপবিদ্ধ মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছিল। জানতে চায়নি, কৌতূহলও দেখায়নি। একটা মানুষের জীবন ন্ধে তার কতটুকু জানা যায়। কজন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অাববাহিত জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

শমিতা স্বাভাবিকভাবেই বিজিতকে কিছু বলেনি। কেউ বলেও না।

জীপ গেটের বাইরে অপেক্ষা করছিল। বিজিত বাহাদুরকে ডেকে জীপে বসল। আর লুকোচুরি করে লাভ নেই। বাহাদুরকে বলে ফেলাই ভাল।

'মাইজীকে পাওয়া যাচ্ছে না বাহাদুর।

বাহাদুর গম্ভীর মুখে বলল, 'মংলুর কাছে শুনলাম সাহেব। কিন্তু মাইজী কোথায় যাবেন। তিনি তো রাস্তাঘাটও চেনেন না। কোনদিন একলা বের হননি।'

বাহাদুরের এ প্রশ্নের উত্তর বিজিতের জানা নেই।

শমিতা দুঃখের আগুনে ঝলসানো মেয়ে। জীবনকে সে দেখেছে। পৃথিবীর বিবরে বিবরে যেখানে কুটিলতা সহস্রফণা নাগিনীর মতন উদ্যত-ছোবল, তার স্বরূপও তার অজানা নয়। গৃহের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে শমিতা এভাবে পথে বের হবে এ যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যতটা সম্ভব অরণ্য তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। বিজিত কি ভেবে স্টেশন পর্যন্ত চলে গেল। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানল, সকাল থেকে যে দুখানা ট্রেন ছেড়েছে, কলকাতার দিকে কিংবা ভিন্ন মুখে তাতে কোন মেয়ে এখান থেকে ওঠেনি।

সারা রাত বিজিত ছটফট করল।

বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব নর্তনে বিজিতের উদ্বিগ্ন অশান্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। উন্মত্ত বাতাস শাল মহুয়ার ডাল ভেঙে পড়ল, নীড়হারা পাখিদের আর্তস্বর ডুবে গেল বাজের গর্জনে, বাংলোর ভিত্তিমূল ধরে কে যেন সবেগে নাড়া দিল। বিজিত বিজ্ঞানের ছাত্র। সে নিয়তি মানে না। কিন্তু ক্ষণেকের জন্য তার মনে হল দেবাশিস গুপ্ত নিয়তির রূপ ধরে তার সংসারে প্রবেশ করেছিল।

ভোরবেলা খোঁজ প.ওয়া গেল।

সব ব্যাপারটা জানিয়ে বিজিত দিন ...

করল। সেটা ...

'ফুলডোবাতে।' এরা বলছে।

একটা পাহাড়ী নদীর নাম ফুলডোবা। এখান থেকে প্রায় মাইল চারেক।

আদিবাসীরা ঠিক দেখেছে। শমিতাকে ফুলডোবাতেই পাওয়া গেল। পরনে হালকা সবুজ রঙের শাড়ী, গোলাপী ব্লাউজ, এলোচুল, মুখের ভাবে সুগভীর প্রশান্তি।

পাওয়া যেত না, গাছের শিকড়ে আটকে ছিল দেহটা।

নিজের সঙ্গে শমিতা সারাজীবন যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু তার মুখে কোথাও সে সংঘাতের চিহ্নমাত্র নেই।

পরের রাত্রে শমিতা এসেছিল।

চেয়ারে [illegible] চুপ করে বসেছিল। ক্লান্ত, অবসন্ন। বিছানায় গিয়ে লাভ নেই। ঘুমের আশা দুরাশা।

সাত মাসের বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি।

এই স্বল্প-পরমায়ু ঘর-বাঁধা আর ঘরভাঙার কথাই বিপিন ভাবছিল।

হঠাৎ খুট করে শব্দ হতে বিপিন মুখ তুলল।

নীলাভ বাতি। [illegible] আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী।

[illegible] শমিতা।

পারল, মৃত্যুর ওপার থেকে আবার শমিতা এসে জীবনের অঙ্গনে দাঁড়াবে।

কপালের ছুটো পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। দপদপ করছে শিরাগুলো।

বিজিত বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বাইরে নিকষকালো অন্ধকার। বিজিতের মনে হল অরণ্য যেন ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করছে।

দিনের বেলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বিজিত ছুটির দরখাস্ত তুলে নিয়েছে। ছুটির তার দরকার নেই। ছুটি নিয়ে মায়ের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কি বলবে? কেন শমিতা সরে গেল তার জীবন থেকে, পৃথিবী থেকে।

মাকে কিছু সে জানায় নি। কি হবে জানিয়ে। একটা মানুষের স্মৃতি সম্বল করে মা বেঁচে আছেন। কি হবে তাঁর জীবনে আর এক শোকের ছায়া ফেলে।

দিনের আলো বিজিতের ভাল লাগে না। রাতের অন্ধকার নামার অপেক্ষায় সে ব্যাকুল।

রাতের অন্ধকারে শমিতা আসে। সান্ত্বনা দিতে? বিজিতের একাকীত্ব ঘোচাতে, নাকি তাকে কাছে ডাকতে।

বিজিত জানে, শমিতা নয়, শমিতার চিন্তা, শমিতার স্মৃতি।

তবু তো বিজিতের নিঃসঙ্গতা কাটে।

বিনিদ্র রজনী মধুর একটা কল্পনায় ভরে ওঠে।

শমিতা আসুক। শমিতাকে তার প্রয়োজন। এ শমিতা কোনদিন জীবন থেকে হারিয়ে যাবে না। কোন আঘাত কোন কলঙ্ক, গত জীবনের ভুল পদক্ষেপ এ শমিতাকে সরিয়ে নিতে পারবে না।